CELEBRATING 75 YEARS

খবরের ঘন্টা

স্বাধীনতা দিবস

- শ্রীঅরবিন্দ ঃ সার্ধ শতবর্ষে ফিরে দেখা
- আত্মার উন্নতিতেই স্বাধীনতার সার্থকতা
- ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে শ্রীঅরবিন্দ ও নিবেদিতা
- শ্রীঅরবিন্দের যোগদর্শন

GREETINGS TO ALL ON THE 150TH
BIRTH ANNIVERSARY OF SRI AUROBINDO
&
75th INDIAN INDEPENDENCE DAY

MOB : 76999-99193

SPJ
Since 1986

SILVER PALACE

GOLD DIAMOND SILVER GEM STONES

Signature Style

The Charm that Shines Forever

Sparkly Magic

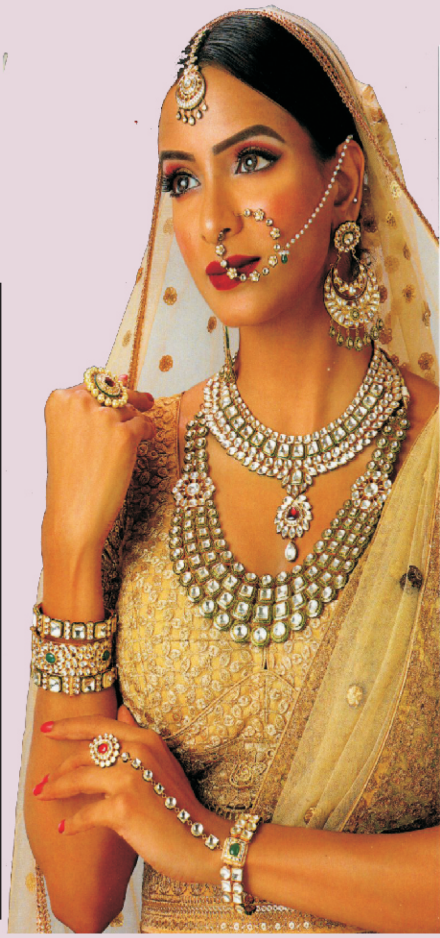

916

MANGAL DEEP BUILDING
HILL CART ROAD, SILIGURI

SILIGURI TERAI B.ED COLLEGE
&
SILIGURI PRIMARY TEACHERS' TRAINING COLLEGE
Recognised by NCTE, Ministry of HRD
Govt. of India
Affiliated to : WBUTTEPA & WBBPE
Admission Open for B.ED & D.EL.ED Course
Web : www.slgttc.com
E mail : slgtbc@gmail.com
CONTACT NO : 97350 61656
DUDHAJOTE, KHARIBARI - 734427
TERAI INTERNATONAL SCHOOL
Registration No : SO185236
HOSTEL ADMISSION FOR - CLASS V to VIII
DAY BOARDING FACILITY
FULL BOARDING FACILITY
TRANSPORTATION FACILITY
EXTRA CURRICULUM ACTIVITY
উত্তরবঙ্গের
একমাত্র বাংলা মাধ্যমের
DAY BOARDING এর
সুবিধাযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
E mail : terai.tis@gmal.com
CONTACT NO : 75869 09494
DUDHAJOTE, KHARIBARI - 734427

GREETINGS TO ALL ON THE 150TH BIRTH ANNIVERSARY OF SRI AUROBINDO

&

75th INDIAN INDEPENDENCE DAY

"In the right view both of life and of yoga all life is either consciously or subconsciously a yoga"

- Sri Aurobindo

"भारत राष्ट्रों का गुरू है, मानव आत्मा का उसके अधिक गंभीर रोगों में चिकित्सक है ; उसके भाग्य में एक बार फिर विश्व के जीवन को नये साँचे में ढालना लिखा है।"

- Sri Aurobindo

SAPPHIRE PAPERS MILL (P) LTD.

3rd Floor, Leelashri Building, Subhash Market, George Mahabert Road,
Siliguri (W.B), Pin-734001, Phone : +91 - 0353-2431040
E-mail : info@sapphirepapers.com

।। শ্রী মাঁ ।।

GREETINGS TO ALL
ON THE 150TH BIRTH ANNIVERSARY
OF SRI AUROBINDO

&

75th INDIAN
INDEPENDENCE DAY

আর. জী.

বস্ত্র বিপনী

RED IS THE COLOR OF PHYSICAL ACTIVITY, CREATIVITY

Ajay Goyal

Mob. : 94340-46134

PATIENT SAFETY & QUALITY OF CARE
NABH
CERTIFIED
NABH Certified
Entry Level SHCO

NORTH BENGAL'S LARGEST PRIVATE EYE HOSPITAL

Restoring Sight, Reviving Lives

THE HIMALAYAN EYE INSTITUTE

Jhankar More, Burdwan Road, Siliguri-734005, W.B.
Phone : 0353-2502500, 2502501, 2502502, 2502505
Mobile : 8900799992, 6297948854
thehimalayaneyeinstitute@gmail.com
www.himalayaneyeinstitute.com
Follow us on

SATELLITE CENTERS : BALAKOBA | JALPAIGURI | ISLAMPUR

OUR TEAM OF EXPERIENCED EYE SURGEONS

DR. ARONI CHAKRABORTY MS
DR. SNEHA BATRA MS
DR. SANGEETA D. GOSWAMI MS, VRF
DR. SHYAMAL SAHA MS
DR. SUPRATIK BANERJEE MS
DR. SWARUP KR. ROY MS, DNB
DR. SANDIPAN BANERJEE MS, FRCS

ALL TYPES OF EYE CARE SERVICES UNDER ONE ROOF

Cataract | Oculoplasty | Vitreo-retina | Squint | Contact Lens | Child Eye Care | Optical Diagnostic | Glaucoma | Pharmacy | Cafeteria | Lab | Low Vision Aids | Ocular Prosthesis

Bringing the world's best technology & treatment facilities

Constellation | 3D OCT | Visu Cam 500 (FFA) | Auto Refractor | Yag laser | Specular Microscope | HFA | Centurion Phaco

With best compliments from :

SACHITRA GROUP OF COMPANIES

MANUFACTURING :

- TARAI FOUNDRY WORKS PVT.LTD
  M.S. STRUCTURALS & WIRE NAILS
- SACHITRA ROLLING MILLS PVT.LTD.
  M.S. ROD M.S. FLATS &
  TORKARY BAR

MANUFACTURING :

- SACHITRA STEEL INDUSTRIES (P) LTD
  GREEN TEA FACTORY
- CHOUDHURY TRADE & INDUSTRIES
  HB WIRE, BLACK WIRE, WIRE NAILS
- SACHITRA FOUNDRY & WIRE INDUSTRIES
  C.I. CASTING

AGRICULTURE :

- BASANTA AGRICO-
  PLANTATION PVT.LTD.

RETAIL :

- PAUL AUTOMOBILES
- M&C IRON STORES
- VIBGYOR ENTERPRISE

SILIGURI INDUSTRIAL ESTATE

SEVOKE ROAD,SILIGURI - 734001

74777 17100,01,02,03, 04,05,06,09, E-mail : mcislg2009@gmail.com

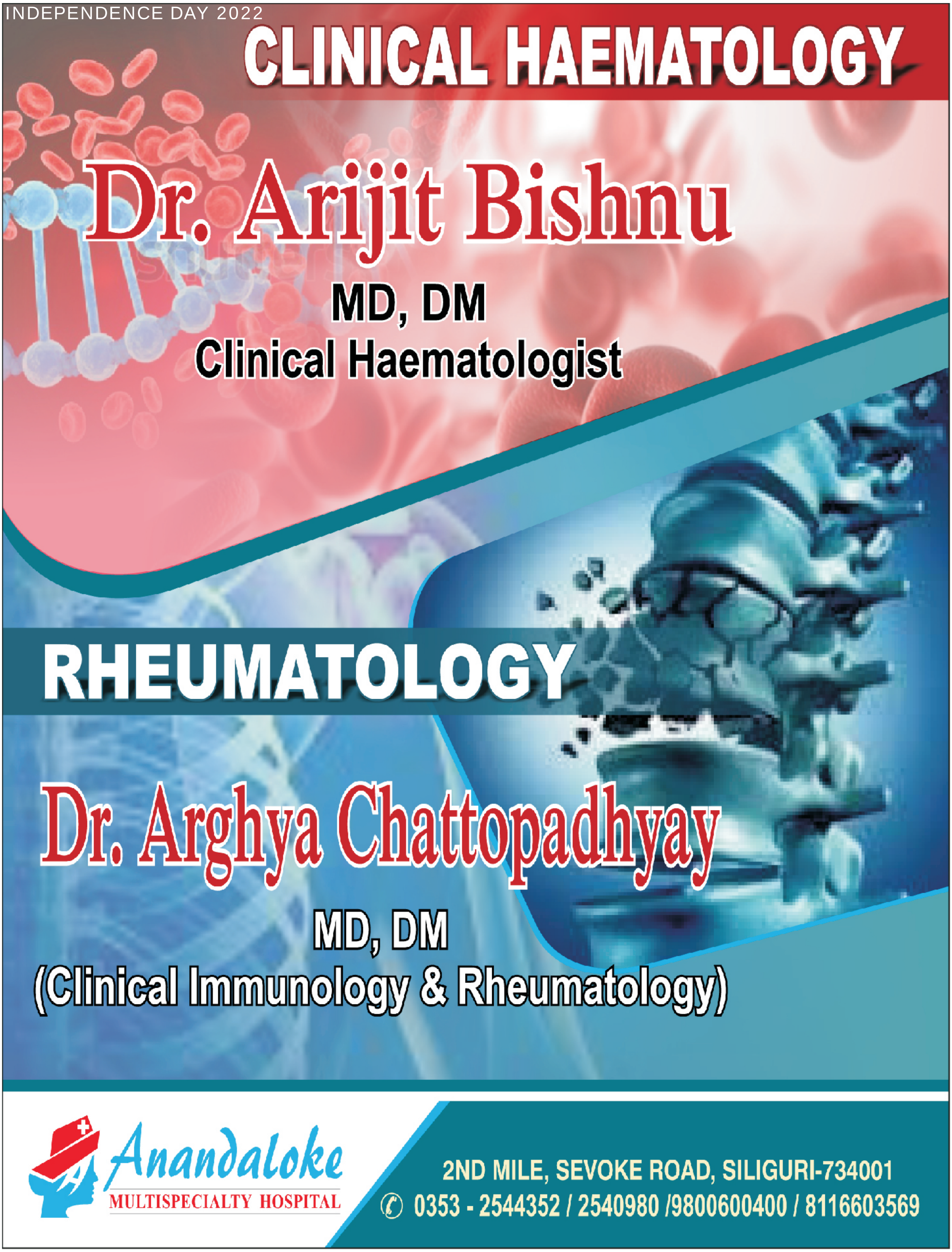

CLINICAL HAEMATOLOGY
Dr. Arijit Bishnu
MD, DM
Clinical Haematologist
RHEUMATOLOGY
Dr. Arghya Chattopadhyay
MD, DM
(Clinical Immunology & Rheumatology)
Anandaloke
MULTISPECIALTY HOSPITAL
2ND MILE, SEVOKE ROAD, SILIGURI-734001
0353 - 2544352 / 2540980 /9800600400 / 8116603569

খবরের ঘন্টা

RNI NO WBBEN/2015/69355
Monthly Magazine
Vol. VI Issue-2

1st August-31st August 2022 **Independence Day**

ষষ্ঠ বর্ষ-সংখ্যা-২ স্বাধীনতা দিবস

২৯শে শ্রাবণ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ

করিমুল হক (পদ্মশ্রী তথা বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা)
জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী)
ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক)
গৌতমবুদ্ধ রায়
মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী)
তরুন মাইতি (সমাজকর্মী)
রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক)
দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ)
সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী)
ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ)
নির্মল কুমার পাল (হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব)
ভারতি ঘোষ (প্রখ্যাত টেবিল টেনিস প্রশিক্ষক)
সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী)
সামসুল আলম (শিক্ষক)
বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী)
সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া)
নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী)

দাম ঃ ২০ টাকা

Editor : Bapi Ghosh
Cover : Sanjoy Kumar Shah
Laser Typing : Bapi Ghosh

Owner Bapi Ghosh, Printer Bapi Ghosh, Publisher Bapi Ghosh, Published from Matrivilla, Arabindapally Siliguri & Printed from Media Zone, Hakimpara (Ashrampara), Siliguri, Editor Bapi Ghosh

সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। স্বত্ত্বাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ কর্তৃক মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত।

KHABARER GHANTA
Aurobinda Pally, Siliguri
e-mail : bapighosh300@gmail.com
Mobile : 98320-64424, 96418-59567 (Whatsapp)

এই পত্রিকায় প্রকাশিত যাবতীয় বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনদাতার, দায়িত্ব পত্রিকার নয়। পত্রিকার লেখকদের মতামত নিজস্ব
সম্পাদক ঃ খবরের ঘন্টা।

সূচীপত্র

বাঙালী মানস ও শ্রীঅরবিন্দ..................পিনাকী চক্রবর্তী..........০৩
ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে শ্রীঅরবিন্দ ও নিবেদিতা....অলক মণ্ডল....০৬
শ্রীঅরবিন্দের বাংলা লেখা..................চিত্তরঞ্জন গোস্বামী..........১২
শ্রীঅরবিন্দের যোগদর্শন..................অনির্বাণ.............................১৬
দায়বদ্ধতা...................................শ্রী অশোক রায়.....................১৮
শ্রীঅরবিন্দ ঃ সার্ধ শতবর্ষে ফিরে দেখা..............রোমি সাহা.........২০
আমার চোখে শ্রীঅরবিন্দ..................রূপকথা চট্টোপাধ্যায়.........২২
আত্মার উন্নতিতেই স্বাধীনতার সার্থকতা...........কবিতা বণিক.....২৩
শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষাতত্ত্ব ও জীবন দর্শন..........সুশ্বেতা বোস........২৪
শ্রীঅরবিন্দ...................................অনিল সাহা.........................২৪
ঋষি অরবিন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ..................নির্মলেন্দু দাস..............২৫
কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা.................মুসাফীর.....২৮
সার্ধ শতবর্ষে শ্রীঅরবিন্দ-দিলীপ কুমার রায় ও সাহানা দেবী...ডালিয়া সরকার..২৯
শ্রীঅরবিন্দ ভাষাবিদ ছিলেন..................ডাঃ গৌরমোহন রায়......৩১
স্বাধীনতা দিবসের ভাবনায়.................সামসুল আলম................৩২
স্বাধীনতা দিবস এবং শ্রীঅরবিন্দ স্মরণে......চিত্তরঞ্জন সরকার......৩৪
Sri Aurobindo Ghosh & his philosophy and spritual vision...36
শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দ কথা......সৌজন্যে ঃ ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশন শিলিগুড়ি..........৪৭

ঃ কবিতা ঃ

সমাধান.......................................ধীময়ী..................................১৯
সবাই আমার বন্ধু.........................ধীময়ী..................................১৯
যুগের হাওয়া..................................গোপা দাস.......................২৭
শহিদ স্মরণে..................................মুকুল দাস........................২৭
ঋষি অরবিন্দ..................চিত্তরঞ্জন সরকার...............................৪০
৭৫ বছরে আমি-ভারত মায়ের অনুভূতি...সজল কুমার গুহ........৪২
উৎস....................................সুলেখা সরকার..........................৪২
ধ্বজা তুলবো ধরে সবাই মিলে.........সজল কুমার গুহ...............৪৪
অন্ধকারের মধ্যেও আলো রয়েছে....বিপ্লব সেনগুপ্ত..................৪৬

ঃ প্রতিবেদন ঃ

একবার বুড়ির ছদ্মবেশে নাড়াজোল রাজ পরিবারের কাছে অর্থ সাহায্য চাইতে এসেছিলেন শ্রীঅরবিন্দ..............................৩৩
সৌন্দর্য চর্চার কাজ শিখে অনেক বেকার ছেলেমেয়ে স্বনির্ভর হচ্ছেন...৩৫
উত্তীবঙ্গের বৌদ্ধ ধর্ম, সংস্কৃতি ও ইতিহাস নিয়ে বই..................৪১
শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলে চক্ষু পরীক্ষা....................................৪৩
মানুষ কিভাবে দেবত্বের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে, শ্রীঅরবিন্দের জন্মসার্ধশতবর্ষে বহু কর্মসূচী ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশনের.........৪৩
শ্রীঅরবিন্দ স্মরণে রচনা ও অঙ্কন প্রতিযোগিতা.........................৪৪

সম্পাদকীয়

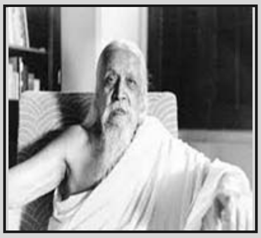

স্বাধীনতার ৭৫ বছর এবং

দেখতে দেখতে আমাদের দেশের স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্ণ হলো। পরাধীনতার গ্লানি মোচন করে এই সময়ে আমরা অনেক উন্নতি করেছি সন্দেহ নেই। কিন্তু এখনও বহু ক্ষেত্রে আমরা পিছিয়ে। এখনও জাতি ও ধর্মের বিভেদ আমাদের অন্ধকার যুগের কথাই স্মরন করিয়ে দেয়। শিক্ষা নিয়ে আমরা বড়াই করলেও বহুক্ষেত্রেই আমাদের কর্মকান্ড আমাদের পিছিয়ে দিচ্ছে।

সম্প্রতি আমাদের নতুন প্রজন্ম মহামারী কি, তার খারাপ কি প্রভাব, তা দেখেছে এবং দেখছে। আমাদের নতুন প্রজন্ম দেখছে, শিক্ষাক্ষেত্রে কিরকম ন্যক্কারজনক সব ঘটনা ঘটছে। চারদিকে এই যে খারাপ আর খারাপ, তার পাশাপাশি ভালোওতো রয়েছে। ভালো বা ইতিবাচক কান্ডকারখানা কি ঘটছে সেটাও নতুন প্রজন্মের সামনে মেলে ধরা উচিত। নতুনরা খারাপ দেখলে তাদের ভালোটাও দেখার সুযোগ করে দিতে হবে। তবেই তো তারা আত্মবিশ্বাস আর মনের শক্তি নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। তাদের মধ্যে আলোর সঞ্চার করার দায়িত্বও আমাদের সকলের। স্বাধীনতার ৭৫ বছরে এই বিশেষ দিকটি নিয়েও ভাবনার সময় এসেছে।

পরাধীনতার অন্ধকার কেমন ছিলো, সেই অন্ধকার কাটাতে আমাদের দেশপ্রেমিক , মনীষীরা কিভাবে কাজ করেছেন তা মেলে ধরা প্রয়োজন নতুন প্রজন্মের সামনে। দেশপ্রেমিক , মনীষীদের জীবন সংগ্রাম বেশি বেশি করে মেলে ধরা প্রয়োজন নতুন প্রজন্মের সামনে। তবেই হবে আজাদি কি অমৃত মহোৎসব পালনের সার্থকতা।

১৫ আগস্টে মহান বিপ্লবী, দেশপ্রেমিক ও অধ্যাত্মসাধক শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিন। এবছর তাঁর জন্মের সার্ধশতবর্ষ। এই পুণ্যলগ্নে বারবার প্রণাম এই মহান সাধককে। শ্রীঅরবিন্দের দেখানো আলোর পথে হেঁটে পরাধীন ভারতেই বহু মানুষ শান্তি এবং অমৃতের সন্ধান পেয়েছেন। এখনও সেই মহান সাধককে আমাদের আরও বেশি বেশি করে স্মরন করা প্রয়োজন। সেদিকে তাকিয়েই খবরের ঘন্টাতে এবারে তাঁর ওপর বিশেষ কিছু লেখা প্রকাশিত হলো।

সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

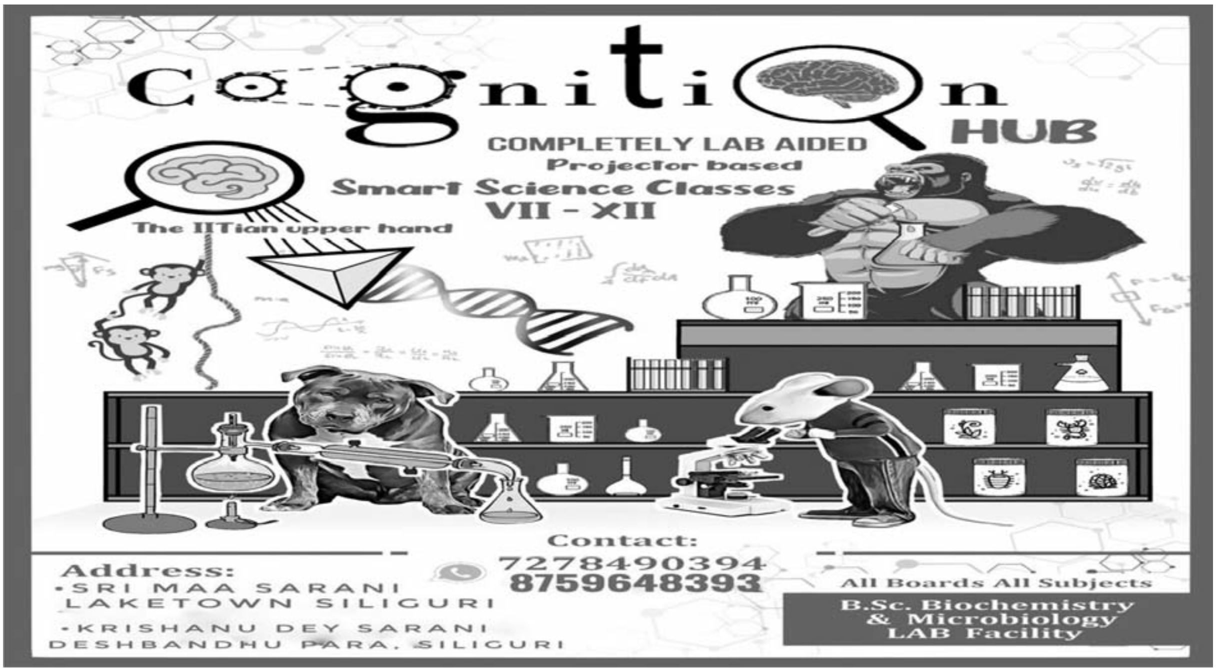

বাঙালি মানস ও শ্রীঅরবিন্দ

পিনাকি চক্রবর্তী

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে অরবিন্দ ঘোষ যখন ফিরলেন অর্থাৎ ১৮৯৩ সালে তখন ভারতবর্ষ জুড়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের ডাক। মাতৃভূমির শৃঙ্খলমোচনে তৎকালীন জনমানসে যে জোয়ার এসেছিল তার ভিত্তিভূমি ছিল বাংলা। অথচ শ্রীঅরবিন্দ বাংলায় এলেন না, থিতু হলেন বরোদায়। ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে মনে হতে পারে বাংলায় যখন তাঁর জন্মস্থান তখন বিদেশ থেকে ফিরে বাংলাইতো তাঁর কর্মস্থান হওয়ার যোগ্য এবং তদুপরি বাংলা তখন দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনে অগ্রনী ভূমিকা নিয়েছিল । এহেন প্রেক্ষাপটকে ব্যবহার না করে শ্রীঅরবিন্দ কেন সুদূর বরোদায় তাঁর কর্মস্থান বেছে ছিলেন?

এহেন প্রশ্নের মুখোমুখি হতে গেলে তৎকালীন বাংলার পরিস্থিতি এবং বাঙালি মানসের চেহারার একটা স্পষ্ট রুপ জানা প্রয়োজন। সিপাহি বিদ্রোহোত্তর বাঙালি মধ্যবিত্ত পারিবারিক ও সামাজিক স্থায়িত্বের প্রয়োজনে ব্যক্তিজীবনের বিকাশকেই প্রধান হাতিয়ার করেছিল। এবং উনবিংশ শতকের বাঙালির কাছে প্রধান নির্দেশ ছিল ব্যক্তিজীবনকে অগ্রাধিকার দিয়ে ধর্ম-নীতি-সমাজ সংক্রান্ত সকল সমস্যার মুখোমুখি হওয়া। আর এই শতাব্দীলব্ধ মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের উত্তরাধিকার যে জন্মলগ্ন থেকেই ঔপনিবেশিক খঞ্জতায় সঙ্কটাপন্ন সে বিষয়ে বাঙালির প্রথম উপলব্ধি ঘটিয়েছিলেন বিবেকানন্দ। তিনি তাঁর কর্মজীবনের বা বলা ভালো কর্মযোগের সারাৎসার তখনই লিপিবদ্ধ করে চলেছিলেন-- সময়টা ১৮৯১-১৯০২। এরই মধ্যে শিকাগো ধর্ম মহাসভায় তাঁর বিস্ফোরক ভাষন ভারতের অধ্যাত্ম সাধনার ভেতরের দিকটিকে বিশেষ আলোয় আনল-- যার ফল ভারতবর্ষ কয়েক হাজার বছর ধরে আগামী পৃথিবীর অধ্যাত্ম জগতের শুধু প্রতিনিধিত্বই করবে না, পথিকৃৎ হিসেবে স্বীকৃত হবে নির্ঘাত। যদিও তার আগে ভারতবর্ষের যে অধ্যাত্ম সাধনা, তার মূল্য অপরিসীম তবুও প্রাচ্যের আত্মিক আলোয় পাশ্চাত্য দেখতে শিখল নিজেকে, চিনতে শিখল, মিলিবে-মেলাবের ভারততীর্থ প্রকাশিত হল।

আমরা জানি উনবিংশ শতকের উত্তরাধিকারপুষ্ট বাঙালি মধ্যবিত্তের দুটি দিক--এক) আত্মকেন্দ্রিকতা ও দুই) প্রত্যক্ষবাদ। শ্রীঅরবিন্দের বরোদা থেকে বাংলায় আসা এবং বাংলায় যে রাজনৈতিক কার্যকলাপ তাতে জড়িয়ে সর্বাসাকুল্যে সাড়ে চার বছর বাংলায় থাকা, যার মধ্যে আবার এক বছর কারাবাস। এই সাড়ে চার বছরের বাংলায় তাঁর কার্যকলাপ আমাদের কাছে প্রমান করে যে,

জয় মা তাঁরা

গোপাল শাস্ত্রী

Mob. : 98323-25692 ( )

কুষ্ঠিবিচার, শত্রুদমন, বিবাহে বাধা, শিক্ষা, চাকুরি
বাস্তুদোষ, মামলা, মোকদ্দমা ও বিভিন্ন
সমস্যা ২২ দিনে সমাধানে বিশেষ পারদর্শী।

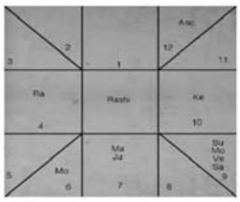

১০০% গ্যারান্টি

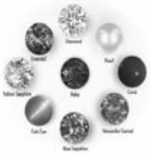

গ্রহরত্ন, তাবিজ, কবজ, টোটকা-এর
দ্বারা সৌভাগ্য ফিরিয়ে আনা হয়।

চেম্বার ঃ "অঞ্জলী অ্যাপার্টমেন্ট" দক্ষিণ ভারত নগর, কল্পনা দত্ত সরণী, ওয়ার্ড নং-২৪, শিলিগুড়ি

রাজনৈতিক কার্যকলাপ তাতে জড়িয়ে সর্বাসাকুল্যে সাড়ে চার বছর বাংলায় থাকা, যার মধ্যে আবার এক বছর কারাবাস। এই সাড়ে চার বছরের বাংলায় তাঁর কার্যকলাপ আমাদের কাছে প্রমান করে যে, ওই আত্মকেন্দ্রিকতা ও প্রত্যক্ষবাদের যে সমন্বয় তিনি তাঁর কর্মজীবনে আমাদের সামনে দৃষ্টান্তস্বরুপ রেখে গেছেন তা বোঝবার মতো বৌদ্ধিক সচেতনতা বা চিত্তের প্রসার আমাদের নেই। নইলে অযথা কিছু অবান্তর স্থূল প্রশ্নের মায়াজাল আজও বাঙালি জিইয়ে রাখত না।

অথচ যে বাস্তবতাবোধের অপর নাম বৌদ্ধিক সচেতনতা এবং যে বৌদ্ধিক সচেতনতার মূল্য লক্ষ্য ছিল তৎকালীন উনবিংশ শতাব্দীর জের সম্পূর্ন মিটিয়ে দিয়ে বিংশ শতকীয় মাত্রায় গোড়াপত্তন তার সূত্রপাত বিবেকানন্দ ঘটিয়ে ফেলেছিলেন নিবেদিতার মাধ্যমে। অর্থাৎ পুরুষ অপেক্ষা নারীর মধ্যেই এই প্রাধান্যের এমফ্যাসিস লক্ষনীয়। আর একথাতো ঠিক ওই সময়ের থেকে হাজার বছরের আগেকার সমাজেও নারীর ট্র্যাজিক ব্যক্তিক উদ্ভাসন তুলনামূলকভাবে অধিক। সমাজের প্রাথমিক প্রতিশ্রুতিতে উদ্দীপিত হয়েছে তারা। সমাজের প্রদত্ত প্রথম আশ্বাসের আহ্বানে চঞ্চল হয়ে সাড়া দিয়েছিল তারা-- অথচ যে সাড়া কোনো তত্ত বা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক আহ্বানের সাড়া নয়। নারীর শক্তির মধ্যেই সেই বিশ্বাসের বীজ নিহিত যা জীবনের অমেয় সম্ভাবনার, আত্মপ্রকাশের ও স্ফুরনের অবকাশে পর্যবসিত।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বন্দেমাতরম গানের মধ্য দিয়ে যে মাতৃভূমির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তারই প্রকাশ আমরা দেখতে পাই মহাভারতের উদ্যোগ পর্বে বিদুলার উপাখ্যানে, ‘ The spirit of the motherland ’-কে শ্রীঅরবিন্দ খুঁজে পেয়েছিলেন। বন্দেমাতরম গানে মা দশভুজা দুর্গা যা হবেন তা বলা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র ভারতজননীকে বলেছিলেন, ‘ ত্বং হি প্রাণা শরীরে’। আর শ্রী অরবিন্দ বললেন ইংরেজ-লাঞ্ছিত দেশমাতা যা হয়েছেন-- অর্থাৎ হৃতসর্বস্বা নগ্নিকা কালী। আর এখানেই একটা কথা বুঝিয়ে দিল সেই নারীশক্তিই যারা প্রতিহত এবং পর্যুদস্ত সব থেকে বেশি-- তারাই সব থেকে ভালো করে একথাটা বুঝিয়ে দিল যে, রিয়্যালিটিকে পরিবর্তিত করার ক্ষমতা না থাকলে সব স্বাতন্ত্র্যের সাধ বা স্বাধীনতার পিপাসাই বৃথা। আর এই ভাবাদর্শের অন্যতম দান ব্যক্তির অশেষত্ব সম্বন্ধে প্রত্যয়। সেই প্রত্যয় নারীর ভিত্তিগত উপাদান।

শ্রী অরবিন্দ বলয়ের মানুষ মাত্রই জানি মায়ের প্রথম ভারতবর্ষে আগমন ঘটে ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ। আর ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিনেই আর্যর প্রকাশ। আর ওই আর্য পত্রিকাতেই শ্রীঅরবিন্দের রচনাবলীর প্রকাশ ঃ

The Life Divine - ১৯১৪ আগস্ট থেকে ১৯১৯ জানুয়ারি।

The Synthesis of Yoga - ১৯১৪ আগস্ট থেকে ১৯২১ জানুয়ারি।

The Secret of Veda -- ১৯১৪ আগস্ট থেকে ১৯১৬ জুলাই।

Isha Upanishad - ১৯১৪ আগস্ট থেকে ১৯১৫ মে।

Kena Upanishad - ১৯১৫ জুন থেকে ১৯১৬ জুলাই।

The ideal of Human Unity - ১৯১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯১৮ জুলাই।

Essays on the Gita (১ম পর্যায়) - ১৯১৬ আগস্ট থেকে ১৯১৮ জুলাই।

The Psychology of Social Development যা পরে Human Cycle নামে প্রকাশিত--১৯১৬ আগস্ট থেকে ১৯১৮ জুলাই।

The Future Poetry ---১৯১৭ ডিসেম্বর থেকে ১৯২০ জুলাই।

Essays on the Gita (২য় পর্যায়)--১৯১৮ আগস্ট থেকে ১৯২০ জুলাই।

The Renaissance in India --১৯১৮ আগস্ট থেকে ১৯১৮ নভেম্বর।

Is India Civilised? --১৯১৮ ডিসেম্বর থেকে ১৯১৯ ফেব্রুয়ারি।

A Rationalistic Critic of Indian Culture --১৯১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯১৯ জুলাই।

A Defence of Indian Culture -- ১৯১৯ আগস্ট থেকে ১৯২১ জানুয়ারি। এই শেযোক্ত তিনটি গ্রন্থ একত্রে হল The Foundation of Indian Culture ।

এই যদি অভিজ্ঞানের পরিমাপ হয় তবে স্বাভিজ্ঞানের পরিমন্ডলটি সূচিত হতে তাঁর উত্তরসূরিদের সাধ ও সাধ্যের, তার প্রেরণা ও পিছুটানের চ্যালেঞ্জ ও আপোসের দ্বিচারিতা কেন? সাধনের অঙ্গ হিসেবে কি পরিবর্জনের ক্রিয়াযোগ তার পাথেয় নয়? বিংশ শতাব্দী অতিক্রমী বাঙালি মানস কিন্তু ভারতচন্দ্রীয় শিব ও ব্যাসের ভাঁড়ামিতে মজে আছে বলেই এই ঈশ্বরিত সম্পদকে আমরা দ্বিধাথরথরচূড়েও যথার্থ মূল্য না দিয়ে নিজেরাই হীন হয়েছি।

এরপর মায়ের স্থায়ী আগমন ও বসবাস-- আশ্রমের সূচনা ও বিকাশ-- শ্রীঅরবিন্দের The Mother গ্রন্থ (১৯২৬) প্রকাশ। নিজে বৃহত্তর সাধনের জন্য পন্ডিচেরীর গুহাভ্যন্তরে নিবিষ্ট হওয়ার মধ্য দিয়ে সিদ্ধির যে বার্তা আমাদের কাছে আজ থেকে প্রায় পঁচাত্তর বছরেরও আগে পৌঁছেছিল তা উপলব্ধি করার প্রধান অন্তরায় সেই বৌদ্ধিক সচেতনতা যা বৃহতের কাছে সমর্পন করতে নারাজ।

যা দিয়ে শুরু করেছিলাম তার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর কিন্তু তাঁর ওই গ্রন্থগুলিতে বর্তমান। তবু অন্ধকারাচ্ছন্ন খন্ড দৃষ্টির প্রেক্ষিতে আমাদের মতো করে একটা উত্তর আমাদের করে নিতে হয় এবং আমাদের চেতনার সীমাবদ্ধতার জন্যই সেই আকুল প্রার্থনা নিঃসংকোচ আহুতি যা আমাদের অহংকারের হাল ছিঁড়ে সারল্যের সুন্দর চেতনার সকাল উপহার দেবে-- তমসো মা জ্যোতির্গময়। অর্থাৎ মানব চলেছে মহামানবের পথে এবং সেই পথের দিশারি শ্রীঅরবিন্দ। বৃহত্তর বাঙালি মানসে এই বিশ্বাস যেদিন মন্ত্রের মতো কাজ করবে সেইদিনই বাঙালি তার আপন সত্তার আলোকে আত্মস্থ হবে।

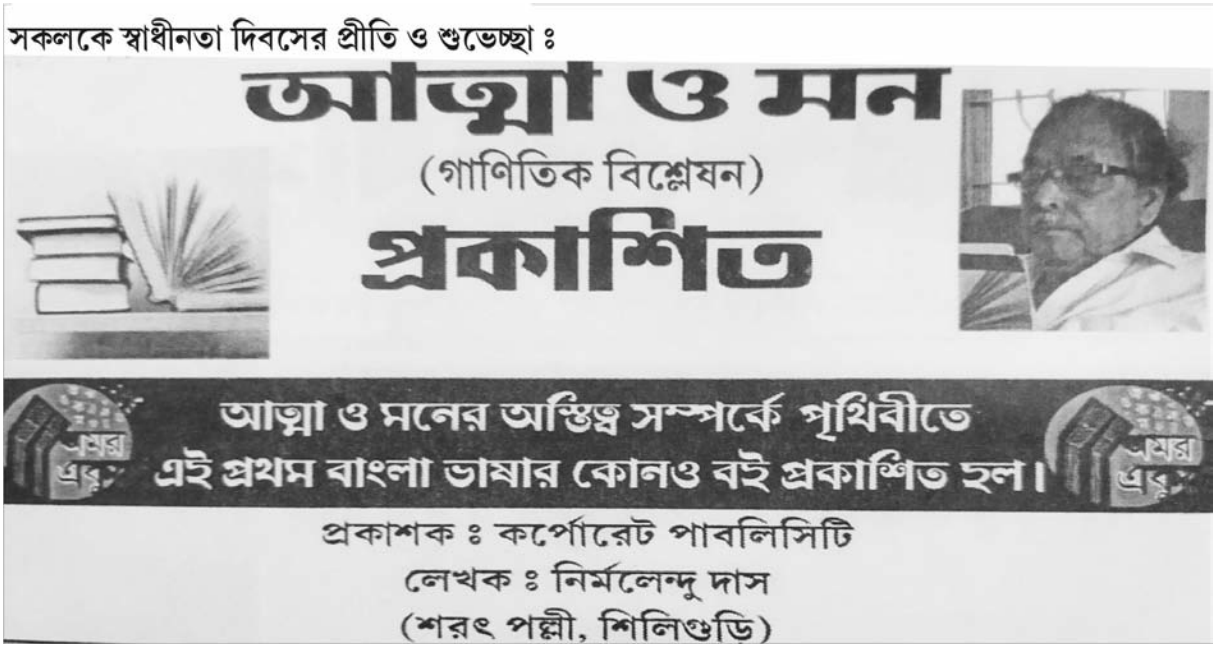

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে শ্রীঅরবিন্দ ও নিবেদিতা

অলক মন্ডল

ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদের স্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দ। ভগিনী নিবেদিতা তারই আদর্শে অনুপ্রাণিত। তিনি এ দেশের জাতীয়তাবোধকে বিপ্লবী চেতনায় রুপান্তরিত করেন। ভারতবর্ষ ছিল তাঁর উপাস্য দেবতা। তাঁর লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষের মুক্তি। ভারতবর্ষকে তিনি স্বদেশরুপে গ্রহন করেছিলেন, তার উপর বিদেশির আধিপত্য এবং ওই শাসনের দুর্নীতি তাঁর মনে প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল এবং এর হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্য সর্বপ্রকার আন্দোলনের প্রতি তাঁর একান্ত সমর্থন ছিল। দেশের সকল তরুন সম্প্রদায়ের জন্য সর্বপ্রকার আন্দোলনের প্রতি তাঁর একান্ত সমর্থন ছিল। দেশের সকল তরুন সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয় ভাব সঞ্চারের জন্য তিনি জ্বলন্ত ভাষায় বক্তৃতা দিয়েছেন। বিপ্লবী তরুণগণ তাঁর নিকট পেয়েছিলেন স্নেহ, প্রেরণা এবং আশ্রয়লাভ। দেশের মুক্তিসাধনায় তিনি বিপ্লবী শ্রীঅরবিন্দকেও সহযোগিতা করেছেন। নিবেদিতার সহায়তা প্রসঙ্গে শ্রী অরবিন্দ নিজে বলেছেন '' বাংলায় আমার রাজনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টায় যিনি সবচেয়ে বেশি সহায়তা করিয়াছেন তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সুযোগ্য শিষ্যা--মহীয়সি নিবেদিতা''। অরবিন্দ নিবেদিতার অক্লান্ত কর্মপ্রয়াস দেশজুড়ে নতুন যুগচেতনার সৃষ্টি করেছিল।

অরবিন্দ নিবেদিতা এই দুই মহাবিপ্লবী যেদিন (২০ অক্টোবর , ১৯০২) পরস্পর মুখোমুখি পরিচিত হন। বাংলার আকাশে সেদিন এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল। নিবেদিতা শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে দেখেছিলেন অমিত শক্তির স্ফূরন। ভগিনী নিবেদিতার জীবনে দুটি তারিখ স্মরনীয়। ১৮৯৬ সালের নভেম্বর মাসে যেদিন লন্ডনে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়, আর ১৯০২ সালের অক্টোবর মাসে যেদিন গুজরাটের বরোদা শহরে অরবিন্দর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। স্বামীজির সঙ্গে সাক্ষাতের গুরুত্ব নিবেদিতার ব্যক্তিগত জীবনে অধিক। আর অরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের গুরুত্ব বৈপ্লবিক জীবনে সমধিক।

সকলকে স্বাধীনতা দিবস এবং শিক্ষক দিবসের আগাম শুভেচ্ছা ঃ

সামসুল আলম

প্রধান শিক্ষক, মুরালীগঞ্জ হাইস্কুল

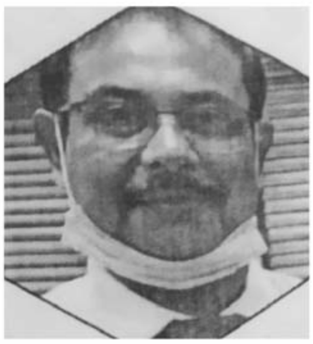

বিধাননগর, শিলিগুড়ি

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন অরবিন্দ একদল প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের নিয়ে ‘ Indian Majlish ’ নামে একটি মজলিশ গড়ে তোলেন। একটি সভায় তিনি প্রথম বিপ্লবের কথা শোনান। কিছুদিনের মধ্যেই অরবিন্দ প্রবাসীবন্ধু ও কয়েকজন আইরিশ ছাত্রদের নিয়ে গড়ে তোলেন এক বৈপ্লবিক সমিতি। সেই সমিতির নাম দেন ‘ Lotus and Dagger ’ এই বিপ্লব সমিতির উদ্দেশ্য ছিল-- বিদেশে বসে দেশের স্বাধীনতার জন্য যথাসম্ভব কাজ করে যাওয়া। সমিতির প্রত্যেক সদস্য শপথ নিয়েছিলেন যে যেভাবে পারেন বৈদেশিক শাসনের নাগপাশ থেকে স্বদেশভূমি ভারতবর্ষের মুক্তির জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। অন্যদিকে নিবেদিতা ভারতবর্ষ আসার আগে লন্ডনে থাকাকালীন আয়ারল্যান্ডের মহান বিপ্লবী প্রিন্স ক্রুপটকিনের ‘ Doctrine of Mutual Aid ’- যা গভর্নমেন্টের অস্তিত্বকে নিষ্ক্রিয়জন মনে করে সেই আদর্শের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন। Irish Home Rule আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিয়েছেন নিবেদিতা। এই ভারতবর্ষে এসে যে জীবন বেছে নেন তাতেও ক্রুপটকিনের আদর্শগত প্রেরণা কাজ করেছিল। অরবিন্দ-ভ্রাতা বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষের মতে--‘নিবেদিতা ছিলেন অরবিন্দেরও অগ্রগামী’। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বরোদায় যখন অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে নিবেদিতার প্রথম সাক্ষাৎ হয় , তখন অরবিন্দ সদ্য বিদেশ থেকে ফিরে বরোদার মহারাজ গায়কোয়াডের অধীনে উচ্চপদে কর্মরত। নিবেদিতা অরবিন্দকে দেখেই বুঝেছিলেন ওই কাজ তাঁর (অরবিন্দের) যথার্থ কাজ নয়। অনুরোধ করেছিলেন বাংলায় ফিরে গিয়ে স্বদেশি আন্দোলনে যোগ দিতে এবং সেই কাজকে ত্বরান্বিত করতে। অরবিন্দ তখন গোপনে সুদূর বাংলায় তাঁর গুপ্ত বিপ্লবী সমিতির কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন। বরোদা থেকে অরবিন্দ প্রেরিত বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় কলকাতার সার্কুলার রোডে (রাজাবাজারের নিকট) বিপ্লব সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০২ সালের প্রথমভাগে অরবিন্দ যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিপ্লব সমিতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে কলকাতায় পাঠান। নিবেদিতা তাঁর পরিচয় পেয়ে তাঁকে এই কাজে আত্মনিয়োগের জন্য বাংলায় চলে আসতে বললেন। বললেন--‘‘কলকাতায় চলে আসুন। আজ এই মুহূর্তে সব বাঙালি এবং সমগ্র বাংলাদেশ স্বদেশি আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আপনার পথ চেয়ে বসে আছেন ” তা শুনে অরবিন্দ বললেন--‘‘ এখনো সময় হয়নি। আমি আরও কিছুদিন অগোচরে থাকতে চাই। তবে সামনে কাজ করার জন্য একজন লোক চাই”। নিবেদিতা তাঁকে আশ্বাস দেন ‘ আপনি আমার ওপর নির্ভর করতে পারেন। আমাকে আপনার বন্ধু বলিয়া জানিবেন। বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিতা নিবেদিতা তাঁর রক্তের তেজকে অরবিন্দের কাজে প্রবাহিত করার বাসনায় প্রদীপ্ত হয়ে ওঠেন।

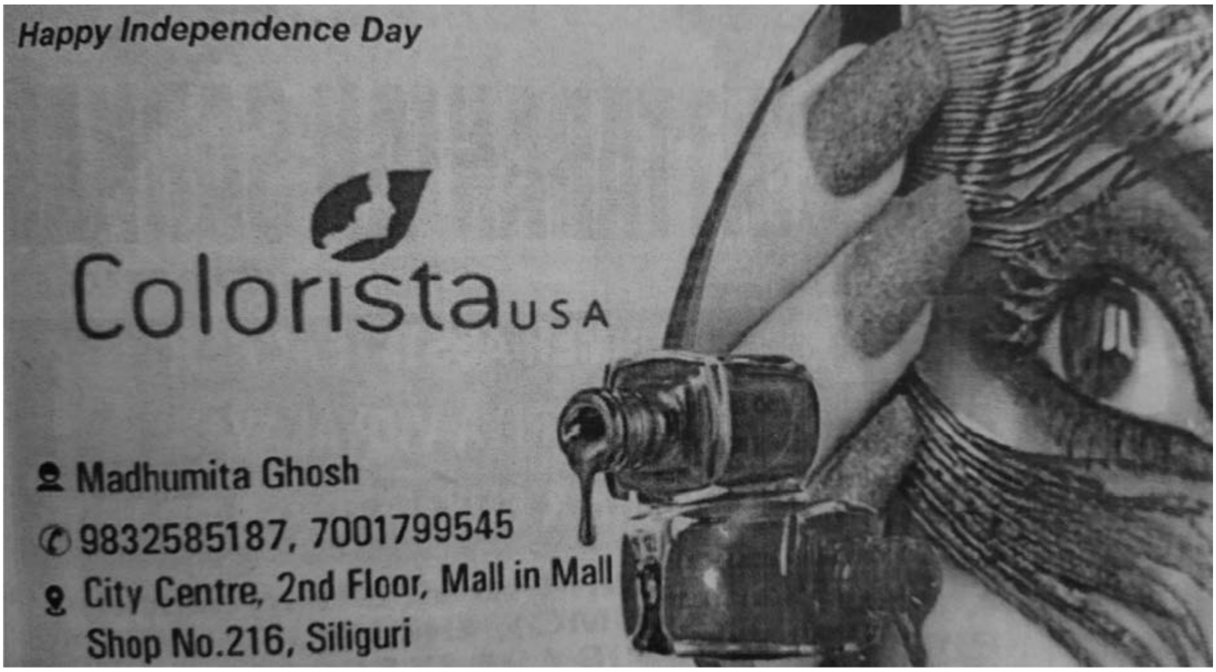

নিবেদিতা ফরাসি জীবনীকার লিজেল রেমঁ লিখেছেন--“ নিবেদিতা বুঝেছিলেন যে অরবিন্দ ঘোষের দ্বারাই বাংলায় স্বদেশি আন্দোলনকে গতিপ্রাপ্ত করা যাবে এবং সেইসময় বাংলায় যেসব স্বদেশি এবং বিপ্লবী সংগঠনগুলো কাজ শুরু করেছিল, সেগুলোর প্রায় বেশিরভাগই তাঁর (অরবিন্দ ঘোষের) দ্বারা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত”। এরপরেই অরবিন্দ বাংলায় এসে স্বদেশি আন্দোলনের কাজকর্ম শুরু করেন এবং ছোট ছোট সব স্বদেশি আন্দোলনের সংগঠনগুলোকে (জাতীয়তাবাদী, নরমপন্থী,চরমপন্থী এবং গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠনগুলোকে পরস্পরের সাথে সংযোগস্থাপন করা এবং একই মন্ত্রে, একটি পতাকার নীচে(জাতীয় পতাকার নীচে) সমবেত করার জন্য পাঁচজনের একটি বিপ্লব কমিটি গঠন করেছিলেন। অরবিন্দ ঘোষ,সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিত্তরঞ্জন দাশ, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভগিনী নিবেদিতা। নিবেদিতা ছিলেন সেই কমিটির সম্পাদক এবং অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব।

বাংলার অন্যতম বিপ্লবী সংগঠন অনুশীলন সমিতি ভগিনী নিবেদিতার প্রত্যক্ষ মদতেই সংগঠিত হয়েছিল। কলকাতায় ফিরেই নিবেদিতা তাঁর বিপ্লবাত্মক বইগুলি বাংলার বিপ্লবীদের দ্বারা পরিচালিত গ্রন্থাগারে দান করেছিলেন। তরুন বিপ্লবীদের হাতে হাতে ঘুরতে লাগল নানাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ও বিপ্লবের কাহিনী। এদের মধ্যে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত যেন দুটি স্ফুলিঙ্গ। নিবেদিতা ওই দুজনকে আশ্বাস দিলেন কেউ তোমাদের পাশে না থাকলেও আমি চিরদিনই থাকব। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ বলেছেন- নিবেদিতা বাংলায় গুপ্তচক্রের সঙ্গে ছিলেন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নিবেদিতা প্রদত্ত লাইব্রেরিই ১০৮ নং আপার সার্কুলার রোডের চক্রের ছিল প্রাণ ও প্রেরণার উৎসমূল। তিনি আরও বলেছেন ‘ সিস্টার নিবেদিতা বাংলার এই প্রথম বিপ্লবকেন্দ্র ভেঙে তাঁর লাইব্রেরির জাতীয়তা বিষয়ক প্রায় দেড় দুশো বই নিঃস্বত্ব হয়ে দিয়েছিলেন।

নিবেদিতার ডায়েরি থেকে জানা যায় তিনি ১৯০২ সালে বক্তৃতা সফরে বাহির হয়ে অক্টোবর মাসে বরোদা গিয়েছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ বলেন,‘নিবেদিতাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য তিনি স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পূর্বেই নিবেদিতার ‘কালী দি মাদার’ পড়িয়া মুগ্ধ হন। নিবেদিতা বলেন, তিনি শুনিয়াছেন অরবিন্দ শক্তির উপাসক। অতঃপর উভয়ের মধ্যে রাজনীতি ও অন্যান্য আলোচনা হয়। অরবিন্দ নিবেদিতার ‘কালী দি মাদার’ বইটিতে অভিভূত ছিলেন। এই বইটি তাঁদের গুপ্ত সংগঠনে পাঠ্য ছিল। গবেষক গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী তাঁর ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ গ্রন্থে লিখেছিলেন স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর পত্নী লেডি অবলা বসু আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, জগদীশচন্দ্র বসু এবং অরবিন্দ ঘোষ উভয়েই নিবেদিতার বোস পাড়া লেনের বাড়িতে সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। নিবেদিতাই স্বামী বিবেকানন্দের রাজযোগ বইখানি অরবিন্দকে বরোদায় প্রথম

সাক্ষাতের সময় পড়িতে দিয়াছিলেন। এই বইখানি পড়িয়াই অরবিন্দ যোগের প্রতি আকৃষ্ট হন।'

১৯০৩সালের জানুয়ারি মাসে বেলুড় মঠের সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্ক ছিন্ন হয়েগেলে তিনি কলকাতায় অরবিন্দের গুপ্ত সমিতির প্রথম পর্বের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাঁর লাইব্রেরির বইগুলি নিয়ে পলিটিক্যাল মিশনারী গড়বার উদ্দেশ্য নিয়ে অরবিন্দের বৈপ্লবিক কর্মে সহায়ক হয়েছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ বলেন, নিবেদিতার সহিত তাঁহার সহযোগিতা সম্পূর্ণরূপে গুপ্ত বিপ্লবের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল (' as my colaboration with her was solely in the secret revolutionary field ')।

স্বদেশি আন্দোলনের ফলে বিলাতী বর্জনের ধুয়ো যখন সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে নিবেদিতা তখন বলেছিলেন ' কেবল কথা আর কথা! কথা আর নয়, এবার কাজ চাই। অরবিন্দ দেশব্যাপী যে বিরাট বিপ্লব সৃষ্টি করেছিলেন নিবেদিতা তাঁর সকল শক্তি নিয়ে তাতে যোগ দেন। দার্জিলিং থেকে ফিরে এসেছিলেন অন্ততঃ বছর খানেক খাটবার মতো স্বাস্থ্য আর সামর্থ্য নিয়ে। আপনার কাজটা কি? জিজ্ঞাসা করলে নিবেদিতা জবাব দিলেন--'আমি শিক্ষয়িত্রী আমার নিজের একটি বিদ্যালয় আছে।' কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি আবার অরবিন্দ ঘোষ স্থাপিত সমিতির একজন সদস্যও।

ইতিমধ্যে ১৯০৬ সালে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের উদ্যত খর্গের বিরুদ্ধে অরবিন্দ নিবেদিতা প্রমুখের গুপ্ত সমিতির আক্রমন, সভা, সমিতি, পত্রপত্রিকায় অগ্নিবর্ষী লেখনী, জনসমাজে উত্তাল তরঙ্গমালার প্রবাহ বিস্তার করল। এসবের পাশাপাশি চলল নিবেদিতা অরবিন্দের গুপ্ত সমিতির অন্তরালে মৃত্যুপাগল দামালদের প্রস্তুতিপর্ব। মানিকতলার মুরারিপুকুর রোডে অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষদের বাড়িতে যে বোমা তৈরির গুপ্ত রসায়নাগারে কাজ চলছিল সে নিবেদিতার সহায়তা ছাড়া সম্ভব ছিল না। এইসব দুঃসাহসী ছেলেদের তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ ল্যাবরেটরিতে বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কাছে পাঠিয়ে দিতেন বোমা তৈরির কৌশল রপ্ত করতে।

স্বদেশি আন্দোলনের সময় বিভিন্ন সভায় নিবেদিতা বক্তৃতা দিতে যেতেন। তাঁর বক্তৃতা প্রসঙ্গে গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীর স্মৃতিকথায় পাই ' পান্থির মাঠে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হইতে বহু সভা হয়। ভগিনী নিবেদিতাকেও ওই সকল সভায় বক্তৃতা দিতে দেখিয়াছি। তাঁহার তো বক্তৃতা নয়, যেন অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হইত। আমরা স্তব্ধ বিস্ময়ে তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকিতাম,আর ভাবিতাম, বলে কি? ইনি কে? কোথা থেকে আসিলেন--' যেন এক জ্বলন্ত অগ্নিশিখা'।

অরবিন্দ নিবেদিতাকে 'বিপ্লবের অগ্নিশিখা' আখ্যা দিয়ে বলেছিলেন-' একমাত্র নিবেদিতাই স্বামী বিবেকানন্দের জীবন, আদর্শ এবং বাণীকে ভারতের জাতীয়তাবাদের খাতে প্রবাহিত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। নিবেদিতা বিদেশিনী হলেও যথার্থ ভারতীয়

সকলকে স্বাধীনতা দিবসের প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ

Ph. : 9832390778

প্রো: দীপঙ্কর সরকার

লোকনাথ ভ্যারাইটি ষ্টোর

রাধাগোবিন্দ বাজার, শিলিগুড়ি-৬

এখানে জেরক্স

ল্যামিনেশন, মোবাইল রিচার্জ এবং মোবাইলের সমস্ত রকম জিনিস পাওয়া যায়।

এবং একনিষ্ঠ স্বদেশী আন্দোলনের নেত্রী'। অরবিন্দের দৃষ্টিতে নিবেদিতা 'বিপ্লবী নেতাদের অন্যতম'। লোকের সংস্পর্শে আসবার জন্য নানা জায়গায় তিনি ঘুরে বেড়াতেন। খোলাখুলি সরল প্রকৃতির মানুষ , বিপ্লবের কথা সকলকে বলতেন, কোনো ঢাকাঢুকি ছিল না তাঁর। যখন বিপ্লব সম্বন্ধে কথা বলতেন, যেন তাঁর আত্মাই তাঁর খাঁটি স্বরুপ-বেরিয়ে আসত, তাঁর পুরো মন ও প্রাণ ভাষার ব্যক্ত হত। একেই বলে আগুন।

শ্রীঅরবিন্দ বিপ্লব চিন্তা প্রদান করতে প্রকাশ করলেন ' বন্দেমাতরম ' পত্রিকা। এই পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দ সহযোগিনী হিসেবে যোগ দেন নিবেদিতা। দুজনের শক্তিশালী কলমে শুরু হল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অগ্নিবর্ষন। 'বন্দেমাতরম ' দাবি তুলল পূর্ণ স্বরাজের। বয়কট আন্দোলনের চিন্তা অরবিন্দের মাধ্যমে গোটা দেশে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল। ক্রমে নিবেদিতা রাজনৈতিক কর্মকান্ডে বিশেষজ্ঞ সশস্ত্র বিপ্লবের সঙ্গে এতবেশি জড়িয়ে পড়লেন যে তাঁর গ্রেফতার এবং ভারত থেকে নির্বাসন অনিবার্য হয়ে উঠল। স্বামীজির ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের গ্রেফতার এবং আদালতে তাঁর হয়ে জামিনদার হওয়ায় সরকারি রোষ আরও বেশি করে তাঁর উপর পড়ল। অবশেষে ১৯০৭-এর ১৩ই আগস্ট নিবেদিতা লন্ডনের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। জাহাজে বসে এই সময় তিনি লিখে ফেলেন তাঁর বিখ্যাত বই ' Master As I saw Him. লন্ডনে বসে ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন সম্পর্কে লিখতে শুরু করেন। লেখা পাঠাতে থাকেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায়। এই সময় বিপ্লবী ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়ে যায়। কারারুদ্ধ হন অরবিন্দ ১৯০৭ সালের ২৪ আগস্ট বন্দেমাতরম রাজদ্রোহ মামলায়। নিষিদ্ধ ঘোষণা হয় বন্দেমাতরম। 'যুগান্তর' সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত হন কারারুদ্ধ।

নিবেদিতা ১৯০৭ সালের আগস্ট মাসে পাশ্চাত্যে গিয়ে দুবছর কাটিয়ে ১৯০৯ সালের জুলাই মাসে কলকাতায় ফিরে আসেন। তার আগে ৬মে ১৯০৯ তারিখে আলিপুর বোমা মামলায় কারাবাসের পরে মুক্তি পেয়েছেন অরবিন্দ। আলিপুর বোমার মামলায় অরবিন্দ মুক্তি পেলে নিবেদিতা ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাসের কোর্টের বোতামে গোলাপফুল গুঁজে দিয়ে বলেছিলেন ' I know you to be great, But did not know to be so great. ' (প্রবন্ধ-- লোকসভা নিবেদিতা-- অশোক কুমার মুখোপাধ্যায়)।

কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে অরবিন্দ ইংরেজি পত্রিকা 'কর্মযোগিন' ও নতুন বাংলা পত্রিকা 'ধর্ম' প্রকাশ করেন। নিবেদিতার মনে হয়েছিল সদ্য কারামুক্ত রাজবিদ্রোহী অরবিন্দের কণ্ঠে নতুন সুর আর '' বন্দেমাতরম'' অপেক্ষা গভীরতর সুর 'কর্মযোগিন'এর । বুঝলেন, বহু শতাব্দীর ইতিহাস অতিক্রম করে কুরুক্ষেত্রের রণভূমি থেকে এসেছে সেই মহামানব কৃষ্ণের বাণী ঃ ' হে অর্জুন ! তুমি যোগী হও, যোগই কর্মের কৌশল। সেই বাণীই আজ অরবিন্দের 'কর্মযোগিন' এর রচনায় প্রতিধ্বনিত।

'কর্মযোগিন' ও 'ধর্ম' দুটি পত্রিকাতেই নিবেদিতা তাঁর শক্তিশালী কলমে জাতীয়তাবাদী বিপ্লবাত্মক লেখা নিয়মিত লিখে গেছেন। নিবেদিতা স্বয়ং উচ্চাঙ্গের লেখক। অরবিন্দ তাঁর মুক্ত প্রশস্তি করেছেন। নিবেদিতাও অরবিন্দের রচনারীতির অত্যন্ত সমাদর করেছেন। সমকালীন ভারতীয় লেখকদের মধ্যে (ইংরেজিতে যারা লিখেছেন) তিনি অরবিন্দকে শ্রেষ্ঠ মনে করেছেন। 'মর্ডাণ রিভিউ' এর জন্য জুন, ১৯০৯ সংখ্যায় অরবিন্দের ' To the sea ' কবিতাটি প্রসঙ্গে নিবেদিতা ' The (tatesman ' এর বিখ্যাত সম্পাদক এস. র‍্যাটক্লিফকে লিখেছিলেন (২০ জানুয়ারি ১৯১০) '' তুমি যেন প্রতি সপ্তাহে কর্মযোগিন পাও, এটা কিভাবে যে চাইছি কি বলব। আমার মতে, ওতে চিন্তা ও স্টাইলের একেবারে বিজয়ীরুপ। অরবিন্দ অসাধারণ।

পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে আপসহীন এবং আইনভঙ্গের প্ররোচক অরবিন্দ কর্মযোগিন এর আইন রক্ষা করে আন্দোলনের নির্দেশ দিচ্ছেন এই পরিবর্তিত ভূমিকার দিকে নিবেদিতার দৃষ্টি এড়ায়নি। নিবেদিতার জাতীয়তাবাদী রচনা সম্পর্কে এত উৎসাহী ছিলেন যে, সেগুলিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য উৎসাহী হন। নিবেদিতা শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে ১৮ আগস্ট,১৯১০ তারিখে র‍্যাটক্লিফকে লিখেছিলেন। ''বিবেকানন্দের হৃদয় এক সৃষ্টি করেছে'' ।নিবেদিতা বলেছেন--'অরবিন্দ ঘোষই একমাত্র ভারতীয় মনস্বী পুরুষ যিনি জাতীয়তাবাদকে সৃষ্টিশীল চরিত্রে আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন নিবেদিতার সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল কেবলমাত্র রাজনীতির ক্ষেত্রেই। কিন্তু একটি ক্ষেত্রে উভয়ের মন একতানে বাঁধা ছিল--রামকৃষ বিবেকানন্দের প্রতি ভক্তির ক্ষেত্রটিতে। নিবেদিতা ছিলেন 'রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের নিবেদিতা'। আর অরবিন্দের ' ভবানী মন্দির'-ও এক আশ্চর্য অর্ঘ।

অরবিন্দ গ্রেফতার হতে পারেন, এরকম গুজব শুনে অরবিন্দ কি করলেন সে সম্পর্কে অরবিন্দ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন ঃ ''(নিবেদিতার বাগবাজারের বাড়িতে) আমার এই প্রকার এক সাক্ষাতের কালে তিনি আমাকে জানালেন--সরকার আমাকে চালান দেবার মতলব করেছে। তিনি চান আমি যেন গা-ঢাকা দিই, কিংবা ব্রিটিশ ভারত ত্যাগ করি এবং বাইরে থেকে অব্যাহতভাবে কাজ করে যাই। --- আমি তাঁকে বললাম, ওই সাজেশন গ্রহনের প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না, তার বদলে কর্মযোগিনে একটা খোলা চিঠি লিখব, যা আমার ধারণা সরকারকে প্রতিনিবৃত্ত করবে। সে কাজ করা

হয়েছিল। পরে যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম, তিনি বললেন, আমার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয়েছে এবং আমাকে চালান দেবার বাসনা পরিত্যক্ত ” । (Sri Aurobindo on Himself থেকে অনূদিত)। উল্লিখিত খোলা চিঠিটি ‘কর্মযোগিন’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৯০৯ সালের ৩০ কিংবা ৩১ জুলাই তারিখে। ১৯০৯ সালের জুলাই মাস থেকে ১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যবর্তী সময়ে অরবিন্দের সম্ভাব্য গ্রেফতার সম্বন্ধে নিবেদিতা ও অরবিন্দের মধ্যে কেবল কথাবার্তা হয়নি, ওই কালের মধ্যে অরবিন্দ নিবেদিতাকে তাঁর গ্রেফতার সম্ভাবনার কথাও বলেছেন।

উমা মুখোপাধ্যায় ও হরিদাস মুখোপাধ্যায় তাঁদের ‘স্বাধীনতা আন্দোলনে যুগান্তর পত্রিকার দান বা ‘ শ্রীঅরবিন্দও বাংলায় বিপ্লববাদ’ গ্রন্থে জানিয়েছেন,অরবিন্দ কলিকাতা ছেড়ে চন্দননগরের উদ্দেশ্যে ১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯১০ সনে রওনা হন, সেখানে পৌছান পরদিন অর্থাৎ ১৫ই ফেব্রুয়ারি। অতএব বোঝা যায় ১৯১০ সালে অরবিন্দের চন্দননগরে পলায়নের সঙ্গে নিবেদিতার পূর্বোক্ত পরামর্শের কোনো সম্পর্ক ছিল না। একথাও বলা হয়েছে যে হাইকোর্টে সি.আই.ডি বিভাগের শামসুল আলমের হত্যাকান্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে অরবিন্দ গ্রেপ্তার হতে পারেন এখবর নাকি নিবেদিতা অরবিন্দকে পৌঁছে দেন। দুজনের মধ্যে ভবিষ্যৎ কর্তব্য সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা হয় এবং তার পরিণতি হল অরবিন্দের চন্দননগরে চলে যাওয়া। অরবিন্দ এ সম্পর্কে লিখেছেন ঃ ‘ Sister Nivedita knew nothing of these new happening till after i reached chandernagore, i did not go to her house or see her .’ যাই হোক অরবিন্দ চন্দননগরে চলে যাবার আগে ‘কর্মযোগিন’ পত্রিকা সম্পাদনা করার ভার দিয়ে যান নিবেদিতাকে। ‘কর্মযোগিন’ এর শেষ সংখ্যাগুলো বের হল নিবেদিতার নিজ দায়িত্বে। প্রয়োজন মত নিজের লেখা প্রবন্ধ অরবিন্দের নামে ছাপতেন। এমনকি ‘কর্মযোগী আদর্শ’ প্রবন্ধটির শেষ দুই অধ্যায়ও তাঁরই লেখা অথচ যোগী অরবিন্দের ভাবধারার যথাযথ প্রকাশ ছিল তাতে।

বারীন্দ্র কুমার ঘোষ লিখেছেন ঃ ‘ এই রজোগুনী তেজস্বিনী নারী পরমার্থপথে এলেও স্বভাবে ছিলেন কর্ম, অন্যায় অত্যচারের বিরুদ্ধে দুঃসাহসী যোদ্ধা।’ আমরা যখন বাংলায় বিপ্লব কর্মের প্রথম পর্বের সূচনার জন্য বরোদায় প্রস্তুত হচ্ছি তখন বিপ্লবী অরবিন্দের সাথে এই তেজস্বিনী অগ্নিমুখী নারীর যোগাযোগ হল। তাঁর (নিবেদিতার) মৃত্যু অবধি তা অবিচ্ছিন্ন ছিল। বারীন্দ্রর লেখা থেকে পরিস্কার। বিপ্লবের প্রেরণাদাত্রী নিবেদিতা বিপ্লবের অগ্নিশিখাকে অনির্বাণ জ্বালিয়ে রেখেছিলেন--তাঁর বক্তৃতা লেখনী এবং সমস্ত সত্তা দিয়ে নিজের লেখাগুলি অরবিন্দের নামে কর্মযোগিন পত্রিকায় প্রকাশ করে দীর্ঘদিন নিবেদিতা ব্রিটিশ শাসকদের বুঝতেই দেননি যে অরবিন্দ অনেক আগেই চন্দননগর হয়ে পন্ডিচেরী চলে গিয়েছেন। বিপ্লবী অরবিন্দ শেষ পর্যন্ত প্রকৃত স্বাধীনতার জন্য কর্মযোগের সাধনাকে শ্রেয় বলে মনে করেছিলেন। রাজনীতি থেকে সরে যাওয়ায় তিনি সমালোচিত হন। তবে রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় যথার্থ মূল্যায়ন করেছেন(রবীন্দ্রজীবনী, ২য় খন্ড) ‘ অরবিন্দকে অন্য সকলে পন্ডিচেরীর সাধক শ্রীঅরবিন্দ ’রূপেই দেখিতেছেন। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে তিনি ছিলেন ভারতে বিপ্লববাদের হোতা। তিনি দার্শনিক বিপ্লববাদ প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। (ঋন স্বীকার ঃ

১) ভগিনী নিবেদিতা(জীবনী) প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, প্রকাশক--সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, প্রথম প্রকাশ, ১৯৫৯, ২) নিবেদিতা লোকমাতা (তৃতীয় খন্ড)-শঙ্করী প্রসাদ বসু, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সং কল-৯, ১৩৯৫ ,৩) ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ--গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, জিজ্ঞাসা,কল-৯, প্রথম প্রকাশ ১৯১০, ৪) শ্রী অরবিন্দ ও বাংলায় বিপ্লববাদ--উমা মুখোপাধ্যায়, হরিদাস মুখোপাধ্যায়, ফার্মা কে এল এম, কলি-১২, আগস্ট,১৯৭২। ৫) ‘প্রমিথিমউসের পথে’(নিবেদিতা সংখ্যা)--প্রকাশ মার্চ--মে, ২০১২, সম্পাদক-শঙ্কর ঘোষ , ৬) জাগ্রত বিবেক পত্রিকা আগস্ট , ২০১৫।

ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কর্মরত তরুন শক্তি পাল। মানুষের প্রয়োজনে মানুষের পাশে থাকার স্বপ্ন প্রত্যয় নিয়ে সমাজসেবার কাজে প্রাথমিকভাবে শুরু হয় তাঁর একক অভিযান। কিন্তু খুব বেশীদিন এই পথে তাঁকে এককভাবে চলতে হয়নি। সমাজের বিভিন্ন স্তরের সহৃদয় মানুষ শিলিগুড়ির তরুন শক্তি পালের হাতে হাত মেলান। বেশ কিছু তরুন তরুনী এগিয়ে আসেন সমাজের অসহায় মানুষকে সহযোগীতা করার জন্য। এভাবেই ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শিলিগুড়ি বাবুপাড়ায় স্থাপিত হয় শিলিগুড়ি ইউনিক ফাউন্ডেশন টিম। বর্তমানে এই সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ৩০। এখন ৩৬৫ দিন ২৪ ঘন্টাই চলে ইউনিক ফাউন্ডেশন টিমের কর্মকাণ্ড। শিলিগুড়িতো বটেই শিলিগুড়ি বাইরেও এখন সুপরিচিত নাম ইউনিক ফাউন্ডেশন টিম। অগণিত মানুষের আর্থিক অনুদানে ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে ইউনিকের সেবামূলক কাজের পরিধি। মূলত এই অনুদান আর ইউনিটের সদস্যদের অদম্য কর্মস্পৃহাই এই সংগঠনের মূলধন। স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে খবরের ঘন্টাও ইউনিক ফাউন্ডেশন টিমের সদস্যদের শুভেচ্ছা জানায়। ইউনিক ফাউন্ডেশন টিমের সামাজিক ও মানবিক কাজকে কুর্নিশ জানায় খবরের ঘন্টা

Siliguri Unique Foundation Team

Babupara, Siliguri

President :Smt. Dipti Paul **Vice-President: Mr. Mithun Sengupta**

Secretary: Mr. Bijay Chhetri

1. SAKTI PAUL (Founder)
2. DIPTI PAUL (President)
3. ARUP DAS GUPTA (Assistant President)
4. BIJAY CHETRI (Secretary)
5. SIBU PAUL (Assistan Secretary)
6. PAYEL GUHA (Treasurer)
7. MUNMUN SINGHA ROY (Assistant Treasurer
8. SUSANTA PAUL (Coordinator)
9. MITHU CHAKRABORTY (Lifetime member)
10. BISWAJIT ROY (Lifetime member)
11. ARPITA SINGHA ROY (Member)
12. SUBHAMAY DIWANJEE (Member)
13. BHANU DAY (Member)
14. MADHUMITA GHOSH (Member)
15. ANUP BOSE (Lifetime member)
16. BILASH DEVNATH (Member)
17. SANGITA KAR (Member)
18. CHAMPA GHOSH (Member)
19. PRITAM DEV (Member)
20. DIPIKA DEV (Member)
21. PRATIMA ROY (Member)
22. SUDIP GHOSH (Member)
23. BISWAJIT CHAKRABORTY (Member)
24. SUBRATO SIKDER (Member)
25. SOMA NANDI (Member)
26. TAPAS NANDI (Member)
27. JAYASREE DAS (Member)
28. RUMA MAHAJAN (Member)
29. RUMPA BASAK (Member)
30. RUPAM (Member)
31. JHUMA MALAKAR (Member)
32. DURBA MOITRA (Member)
33. Tapan Chaki (Member)

শ্রীঅরবিন্দের বাংলা লেখা

চিত্তরঞ্জন গোস্বামী

শ্রীঅরবিন্দ কৈশোর থেকে সুরু করে দেহরক্ষার অল্পদিন পূর্ব্ব পর্যন্ত কাব্য রচনা করেছেন,কিন্তু সে ইংরাজিতে। যোগদর্শন, শিক্ষা, সমাজ ইত্যাদি বিষয়ে শ্রী অরবিন্দের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলি সবই ইংরাজিতে। ফল এই হয়েছে যে, তিনি যে চমৎকার বাংলা গদ্য লিখেছেন এবং বাংলায় বেশ কয়েকখানা ক্ষুদ্রাকার পুস্তক তাঁর আছে, সে কথা সাধারণ শিক্ষিত বাঙালি ভুলেই গেছেন। তাঁর হাতের বাংলা গদ্য সুগদ্য, উত্তম গদ্য, এ বিষয়েকোন সন্দেহ নেই।

শ্রীঅরবিন্দের বেশিরভাগ বাংলা লেখা ১৯০৬ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যেকার , যে সময়ে তিনি ছিলেন বাংলাদেশে জাতির মুক্তি সংগ্রামের নেতা। 'শ্রীঅরবিন্দের পত্র'--বিখ্যাত তিনটি পত্র স্ত্রীর নিকট লিখিত হয় যথাক্রমে আগস্ট ১৯০৬, ফেব্রুয়ারি ১৯০৭ ও ডিসেম্বর ১৯০৭-এ। 'ধর্ম ও জাতীয়তা' এবং 'গীতার ভূমিকা'র নিবন্ধগুলি 'ধর্ম' কাগজে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়--১৯০৯-১০ সালে জেল থেকে মুক্তি ও কলিকাতা ত্যাগের পূর্ব্বে। ওই সময়েরই রচনা 'জগন্নাথের রথ' ও 'কারাকাহিনী'। 'কারাকাহিনী'র একটি অংশ ' ভারতী'তে, আর একটি পন্ডিচেরী থেকে প্রকাশিত 'সুপ্রভাতে' ছাপা হয়েছিল। পুস্তকাকারে বেরোয় ১৯২২ সালে। 'বিবিধ রচনা' নামে যে বইটি প্রথম মুদ্রিত হয় ১৯৫৫ সালে, তার প্রথম দুটি রচনা পন্ডিচেরী যাত্রার পূর্ব্বের বলে মনে হয়, বাকিগুলি পন্ডিচেরীতে লেখা, খুব সম্ভব ১৯১৪-১৫ সালে। ১৯২০ সালে যে একটি দীর্ঘপত্র--পন্ডিচেরীর পত্র--শ্রীঅরবিন্দ লেখেন সদ্য আন্দামান ফেরত কনিষ্ঠ বারীন্দ্রকুমারের কাছে, সেটি ওই বছরই সংক্ষিপ্তকারে 'নারায়ণ' কাগজে এবং পরে পূর্ণাকারে বারীন্দ্র কর্তৃক পুস্তিকারুপে প্রকাশিত হয়। তারপর দীর্ঘ ১৪ বছর বাংলা লেখা বন্ধ, ১৯৩৪--৩৫ সালে কয়েকজন সাধিকার প্রশ্নের উত্তরে বাংলায় যে সমস্ত চিঠি লেখেন, সেগুলো দুই ভাগে বেরোয় ১৯৫১ ও ১৯৫৯ সালে।

শ্রীঅরবিন্দের বাংলা লেখার পরিমান সত্যিই বেশি নয়, ইংরাজীর তুলনায় নিতান্ত নগণ্য। কিন্তু গুনগত বিচারে আদৌ উপেক্ষনীয় নয়।

স্ত্রীর পত্র তিনটি শ্রীঅরবিন্দের ওই সময়কার চিত্তের দর্পনস্বরুপ। ব্যক্তিত্বের প্রকাশেই গদ্য সাহিত্য হয়ে ওঠে। পত্রগুলোর প্রতিটি ছত্রে রয়েছে লেখকের অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের ছাপ, যেমনি বক্তব্য, তেমনি ভাষা--ঋজু বলিষ্ঠ প্রাণবন্ত। নিজের তিনটি পাগলামি-- দেশহিতৈষা, ঈশ্বরলাভেচ্ছা ও দেশকে মাতৃজ্ঞানের কথা বলে লিখছেন, ''এখন বলি, তুমি এ বিষয়ে কি বলিতে চাও? স্ত্রী স্বামীর শক্তি, তুমি উষার শিষ্য হইয়া সাহেব পূজা-মন্ত্র জপ করিবে? উদাসীন হইয়া স্বামীর শক্তি খর্ব্ব করিবে? না সহানুভূতি ও উৎসাহ দ্বিগুণিত করিবে?'' ইত্যাদি। দ্বিতীয় পত্রের খানিকটা, ''তুমি এখানে এস, তখন যাহা বলিবার আছে, তারা বলিব, কেবল এই কথাই এখন বলিতে হইল যে, এর পরে আমি আর নিজের ইচ্ছাধীন নই, যেইখানে ভগবান আমাকে লইয়া যাইবেন, সেইখানে পুতুলের মত যাইতে হইবে, যাহা করাইবেন তাহা পুতুলের মত করিতে হইবে।''এইপত্রগুলো পড়ে পাঠকমাত্রেই আনন্দ পাবেন।

'ধর্ম্ম ও জাতীয়তা'র দুটি অংশ, প্রথম অংশে গীতা, উপনিষদ, পুরান ইত্যাদি সম্পর্কিত প্রবন্ধ, সনাতন ধর্ম্মের তত্ত্বব্যাখাই উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় অংশে জাতীয়তা ও সমাজতত্ত্ববিষয়ক কতকগুলি লেখা। বিষয়ের প্রয়োজনে ভাষা এখানে গম্ভীর, গাঢ়বদ্ধ। অনুভূতি ও চিন্তার গভীরতা সমুচ্চ প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু কাঠিন্য নেই , শুস্কতা নেই। আবেগ আছে, কিন্তু সংযত, প্রত্যয়ের দৃঢ়তা ও পাঠককে উদ্বুদ্ধ করার দায়িত্ববোধ ভাব ও ভাষাকে শক্তিময় ও গতিশীল করে তুলেছে, লেখার অন্তরালে লেখকের উপস্থিতিও স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। দুটি অংশ, 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, ইহাই মায়াবাদের মূলমন্ত্র। এই মন্ত্র যে-জাতির চিন্তাপ্রণালীর মূলমন্ত্ররুপে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই জাতির মধ্যে জ্ঞানলিপ্সা, বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসপ্রিয়তা বর্দ্ধিত হয়, রজঃশক্তি তিরোহিত হইয়া সত্ব ও তম প্রাবল্যপ্রাপ্ত হয় এবং একদিকে জ্ঞানপ্রাপ্ত সন্ন্যাসী, সংসারে জাতবিতৃষ্ণ প্রেমিক ভক্ত ও শান্তিপ্রার্থী বৈরাগীর সংখ্যাবৃদ্ধি, অপরদিকে তামসিক অপ্রবৃত্তিমুগ্ধ অকর্ম্মণ্য সাধারণ প্রজার দুর্দ্দশাই সংঘটিত হয়। ভারতে মায়াবাদের প্রচারে তাহাই ঘটিয়াছে।'' ('মায়া', পৃ.১৮-১৯)। '' আমাদের বাহুবল নাই, যুদ্ধের উপকরণ নাই, শিক্ষা নাই, রাজশক্তি নাই, আমাদের কিসেতে আশা, কোথায় সেই বল, যাহার ভরসায় আমরা প্রবল শিক্ষিত ইউরোপীয় জাতির অসাধ্য কাজ সাধন করিয়ে প্রয়াসী হই? স্বীকার করিলাম, আমরা যুদ্ধ করিতে অসমর্থ, আমরাও যুদ্ধ করিতে পরামর্শ দিই না। কিন্তু ইহা কি সত্য কথা যে, বাহুবলই শক্তির আধার, না শক্তি আরও গূঢ় গভীর মূল হইতে নিঃসৃত হয়?''(' আমাদের আশা')। 'সাময়িকী'তে প্রকাশিত হলেও প্রবন্ধগুলোর আকর্ষণ চিরন্তন, বিদগ্ধ পাঠক এগুলো পড়ে গভীর তৃপ্তি পাবেন। 'গীতার ভূমিকা'র ভাষাও অনুরুপ, যেন ভার একটু কম, সাবলীলতা কিঞ্চিৎ বেশি। গীতা পাঠ করতে গেলেই আধুনিক মনে যে সমস্ত প্রশ্ন ও সমস্যা জাগে, তাদের আলোচনা ও সমাধান এখানে মেলে। দু'খানি বই-ই জনপ্রিয় হয়েছে। আমার হাতে

রয়েছে পঞ্চম সংস্করনের এক একটি কপি।

আর একটি চমৎকার বই 'জগন্নাথের রথ' ।তাতে আছে বিখ্যাত দুর্গাস্তোত্র এবং আর চারটি রচনা-- হিরোবুমি ই'তো, আর্য্য আদর্শ ও গুণত্রয়, জগন্নাথের রথ, স্বপ্ন। শেষের দুটির কথাই সংক্ষেপে বলব। 'স্বপ্ন' একটি উপভোগ্য কাহিনী, এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলা যায়, ভাষা স্বচ্ছতোয় প্রস্রবণের মত ছুটে চলে, অথচ এর মধ্য দিয়ে লেখক কর্ম্মফল পাপপুণ্য, সুখদুঃখের তত্ব, সবই পরিস্কার করে তুলে ধরেছেন। ভাষার নমুনা ঃ 'হরিমোহন হতবুদ্ধি হইয়া শ্রীকৃষ্ণের দিকে চাহিল। বালক তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে, অথচ যে বালক আসিতেছে, সেও অবিকল শ্রীকৃষ্ণ। অপর বালক আসিয়া সন্ন্যাসীকে আলো দেখাইয়া বলিল, 'দেখ কি এনেছি'। সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, 'এলি ?এতদিন না খাওয়াইয়া রাখিলি যে ? যাক, এলি তো বোস, আমার সঙ্গে খা।'' 'জগন্নাথের রথ'একটি অতি উৎকৃষ্ঞ প্রবন্ধ। প্রজ্ঞাবান শক্তিমান লেখক যে কত কম কথায় কত বেশি বলতে পারেন, এটি তার উদাহরন।। চৌদ্দ পনের শ'শব্দের মধ্যে বলতে গেলে শ্রী অরবিন্দ তাঁর গোটা সমাজদর্শনকে তুলে ধরেছেন। সংসারকে জগন্নাথের রথ,তথা ভগবানের লীলা নিকেতন কি ভাবে করে তোলা সম্ভব, তা স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন। অথচ লেখাটি ভারী নয় এবং বেশকয়টি ছবিতে উজ্জ্বল। মনুষ্য সমাজের তামসিক রুপটি ঃ 'মলিন পুরান কচ্ছপগতি আধভাঙ্গা গরুর গাড়ি টানে কৃশ অনশনক্লিষ্ট আধমরা বলদ, চলিতেছে সঙ্কীর্ণ গ্রাম্য পথে, একজন ময়লা কাপড়-পরা ভুঁড়ি-সর্ব্বস্ব শ্লথ শুনিতে শুনিতে অতীতের কত বিকৃত আধ আধ স্মৃতিতে মগ্ন। এই মালিকের নাম তামসিক অহঙ্কার''। সাধারণভাবে শ্রীঅরবিন্দের ভাষার ভিত্তিতে বঙ্কিমের রচনাবলী , বঙ্কিম তিনি বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত পড়েছিলেন। কিন্তু তাঁর লেখায় বঙ্কিমী রীতির প্রতিধ্বনি মেলে না, মানসিকতার মৌলিকতা তাঁর বাচনভঙ্গিকেও করে তুলেছে সম্পূর্ণ স্বকীয়।

'কারাকারিনী' সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের রচনা। বিচার সাপেক্ষে পুরো এক বছর (মে ৪,১৯০৮-- মে ৫, ১৯০৯) শ্রীঅরবিন্দ আলিপুর জেলে অন্তরীণ ছিলেন। অসহযোগ বা আইন অমান্য আন্দোলনের কারাবাস নয়, একেবারে খুনী আসামীদের ব্যবস্থা। অল্পদিন ছাড়া গোটা বছরটাই কাটে নির্জ্জন লোহার গারদে। কিন্তু কারাকাহিনী দুঃখের কাহিনী নয়, দুঃখ কি ভাবে উপভোগ করেছেন, তারই ইতিহাস-- যোগী শ্রীঅরবিন্দের অন্তরের ছবি,-- ''বলিয়াছি এক বৎসর কারাবাস, বলা উচিত ছিল এক বৎসর বনবাস, এক বৎসর আশ্রমবাস।'' ব্যক্তিগতভাবে কোন দুঃখই তাঁকে স্পর্শ করে নি, কিন্তু মানবতার লাঞ্ছনায় তিনি বেদনা বোধ করেছেন। তাই কৌতুকের মধ্যেও দেখি কটাক্ষ--'সভ্য' ব্রিটিশ রীতির প্রতি। ''বাটীর জাত নাই, বিচার নাই, কারাগৃহে যাইয়া যেই বাটীতে জল নিয়া শৌচক্রিয়া করিলাম, সেই বাটীতেই মুখ ধুইলাম,স্নান করিলাম, অল্পক্ষন পর আহার করিতে হইল, সেই বাটীতেই ডাল বা তরকারি দেওয়া হইল। সেই বাটীতেই জলপান করিলাম এবং আচমন করিলাম। এমন সর্ব্বকার্য্যক্ষম মূল্যবান বস্তু ইংরাজের জেলেই পাওয়া সম্ভব।''জেলের আহার, পাহারার ব্যবস্থা, চিকিৎসা , সব কিছুরই সরস কৌতুককর বর্ণনা পাই। কতগুলো চরিত্রও অপূর্ব্ব নৈপুণ্য চিত্রিত হয়েছে। বহু মূত্র রোগগ্রস্ত ক্ষীণপ্রাণ জেলার যোগেন্দ্রবাবু, মৌলবী শামস-উল-আলম ডিটেকটিভ অতি বাস্তব চরিত্র। ডিটেকটিভের শিকার কৌশল--'' এই মহাত্মা নিজের জীবনচরিতের একটি পাতা আমাকে খুলিয়া দেখাইয়া বলিলেন, ' আমার জীবনে যত নৈতিক বা আর্থিক উন্নতি হইয়াছে, আমার বাপের একটি অতি মূল্যবান উপদেশই তাহার মূল কারণ। তিনি সর্ব্বদা বলিতেন, 'সম্মুখের অন্ন কখনও ছাড়িতে নাই। এই মহাবাক্য আমার জীবনের মূল মন্ত্র, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ করিয়াছি বলিয়া আমার এই উন্নতি।' ইহা বলিবার সময় মৌলবী সাহেব যে তীব্র দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিলেন, তাহাতে আমার বোধ হইল যেন আমিই তাঁহার সম্মুখের অন্ন''।

কারাকাহিনীর আর একটা দিক হল বিচারের প্রহসন। এখানেও অনেক মজার বর্ণনা আছে। ''নর্টন সাহেব (সরকারি ব্যারিস্টার) ভাল মন্দ, সত্য মিথ্যা, সংলগ্ন অসংলগ্ন, অণোরণীয়ান মহতো মহীযান যাহা পাইতেন, একটিও ছাড়েন নাই, তাহার উপর স্বয়ং কল্পনাসৃষ্ট প্রচুর (uggestion– inference ,hypothesis যোগাড় করিয়া এমন সুন্দর plot রচনা করিয়াছিলেন যে, শেকসপীয়র ডেফো ইত্যাদি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি ও উপন্যাস লেখক এই মহাপ্রভুর নিকট পরাজিত হইলেন। নর্টন সাহেব এই নাটকের নায়করুপে আমাকেই পছন্দ করিয়াছিলেন দেখিয়া আমি সমধিক প্রীতি লাভ করিয়াছিলাম। যেমন মিল্টনের Paradise Lost -এর শয়তান, আমিও তেমনি নর্টন সাহেবের plot এর কল্পনাপ্রসূত মহাবিদ্রোহের কেন্দ্রস্বরুপ অসাধারণ তীক্ষ্ন বুদ্ধিসম্পন্ন ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালী bold bad man , আমিই জাতীয় আন্দোলনের আদি ও অন্ত, স্রষ্টা পাতা ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সংহারপ্রয়াসী। উৎকৃষ্ট ও তেজস্বী ইংরাজী লেখা দেখিবামাত্র নর্টন লাফাইয়া উঠিতেন ও উচ্চৈঃস্বরে বলিতেন, 'অরবিন্দ ঘোষ'। সেসন্স আদালতে আমি নির্দ্দোষী প্রমাণিত হওয়ায় নর্টনকৃত plot এর শ্রী ও গৌরব বিনষ্ট হয়। বেরসিক বিচক্রফট (সেসন্স জজ) হ্যামলেট নাটক হইতে হ্যামলেটকে বাদ দিয়া বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কাব্যকে হতশ্রী করিয়া গেলেন। সমালোচককে যদি কাব্য পরিবর্ত্তন করিবার অধিকার দেওয়া হয়, তাহা হইলে এইরুর দুর্দ্দশা হইবে না কেন?'' ভাষার স্বাচ্ছন্দ্য ও শক্তি লক্ষনীয়।

কারাকাহিনীতে অন্যান্য বিপ্লবীদের নির্ভীক নিরুদ্বিগ্ন ছবিও পাই। এই সুখপাঠ্য গ্রন্থখানির ঐতিহাসিক মূল্যও কম নয়।

'বিবিধ রচনা'-- এটি পূর্ণতার আদর্শ, উপনিষদে পূর্ণযোগের কথা এবং বেদের মর্ম্মার্থ বিষয়ে কতকগুলি প্রবন্ধের সঙ্কলন। দর্শন ও তত্ত্বের আলোচনা, অথচ খুবই স্বচ্ছ ও প্রাঞ্জল। Arya কাগজে যে সময় (ecret of the) edas লিখছিলেন,সে সময়ে বাংলাতেও বেদের মর্ম্মকথা ও অনুবাদ প্রকাশ করার ইচ্ছা করেন। '' এই সকল বেদতত্ব বাঙ্গালী পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিতে ইচ্ছা রহিয়াছে। আপাততঃ কেবল বেদের মুখ্যকথা সংক্ষেপে বলিব''। এই অভিপ্রায় পূর্ণ হলে বেদের সঙ্গে শিক্ষিত বাঙ্গালীর পরিচয় সহজ হত। এমন পরিস্কার অনুবাদ--'' অগ্নিকে ভজনা করি, যিনি যজ্ঞের দেব, পুরোহিত, ঋত্বিক হোতা এবং আনন্দ ঐশ্বর্য্যের বিধানে শ্রেষ্ঠ।''-- বাংলায় নেই। তাছাড়া বেদের তাৎপর্য্য যদি হয় অর্দ্ধসভ্য মানুষের প্রকৃতি পূজা অথবা পার্থিব ভোগ সম্পদের জন্যে যজ্ঞীয় প্রার্থনা, তবে ওগুলোতে মন নিবিষ্ট করার উৎসাহ থাকে না। ''বেদ সংহিতা ভারতবর্ষের ধর্ম্ম , সভ্যতা ও অধ্যাত্মজ্ঞানের সনাতন উৎস। কিন্তু এই উৎসের মূল অগম্য পর্ব্বতের গুহায় নিলীন, তাহার প্রথম স্রোতও অতি প্রাচীন ঘন কন্টকময় অরণ্যে পুষ্পিত বৃক্ষলতা ও গুল্মের বিচিত্র আবরণে আবৃত। বেদ রহস্যময়। ভাষা, কথার ভঙ্গি, চিন্তার গতি, অন্য যুগের সৃষ্টি, অন্য ধরনের মনুষ্যবুদ্ধিসম্ভূত।''-- এ পডিতি বাংলা নয়, শিল্পীর হাতের রচনা।

'পন্ডিচেরীর পত্রে' আবার শ্রীঅরবিন্দকে অন্তরঙ্গভাবে পাই। ভ্রাতার জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি তাঁর দর্শন ও যোগের এবং জীবনের মহান ব্রতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। ভাষার দিকে যেন নজর নেই, প্রচুর ইংরাজী শব্দের ব্যবহারে তাই মনে হয়। কিন্তু এতে করেই লেখায় এসেছে একটা তীক্ষ্ন ঋজুতা। ''তুমি বলছ--চাই ভাবোন্মাদনা, দেশকে মাতানো। রাজনীতিক্ষেত্রে ও-সব করেছিলাম, স্বদেশী সময়ে যা করেছিলাম, সব ধূলিসাৎ হয়েছে। অধ্যাত্মক্ষেত্রে কি শুভকর পরিণাম হবে? আমার যোগের প্রতিষ্ঠা করতে চাই বিশাল ধীর সমতা, সেই সমতায় প্রতিষ্ঠিত আধারে সকল বৃত্তিতে পূর্ণ দৃঢ় অবিচলিত শক্তি, শক্তি সমুদ্রে জ্ঞানসূর্য্যের রশ্মির বিস্তার, সেই আলোকময় বিস্তারে অনন্ত প্রেম, আনন্দ, ঐক্যের স্থির ecstasy । লাখ লাখ শিষ্য চাই না, এক শ ক্ষুদ্র আমিত্ব-শূন্য পুরো মানুষ ভগবানের যন্ত্ররূপে যদি পাই , তাই যথেষ্ট। প্রচলিত গুরুগিরির উপর আমার আস্থা নাই, আমি গুরু হতে চাই না। আমার স্পর্শে জেগে হোক, অপরের স্পর্শে জেগে হোক, কেহ যদি ভিতর থেকে নিজের লুপ্ত দেবত্ব প্রকাশ করে ভগবৎজীবন লাভ করে, এটাই আমি চাই। এইরুপ মানুষই এই দেশকে তুলবে।''

এই পত্রে এবং পরবর্তী লেখা 'পত্রাবলী'তে শ্রীঅরবিন্দ ভাষায় চলতি রীতির ব্যবহার করেছেন। সাধু চলতি কোন রীতির লেখাতেই কলাকৌশল প্রকট নয়। স্বচ্ছতা ও ঋজুতাই এই লেখার বৈশিষ্ট্য।

পত্রাবলীতে আবার অন্য সুর। এই পত্রগুলিও ব্যক্তিত্বময়, কাজেই সাহিত্য। কিন্তু এ ব্যক্তি একেবারে অনন্য। শিষ্যাকে ভরসা দিচ্ছেন, উৎসাহ দিচ্ছেন, সহানুভূতি আছে, কিন্তু তবু যেন মনে হয়-- অনেক দূরের মানুষ তিনি, হিমালয়ের স্তব্ধতা ও মহিমা তাঁর। তিনটি পত্রখন্ড উদ্ধার করা যাচ্ছে। ''ভীত বা বিচলিত হয়ো না, যোগপথের নিয়ম এই, অন্ধকারের অবস্থা অতিক্রম করে যেনো হয়, অন্ধকারেও শান্ত হইয়া থাক।'' '' এটা খুব বড় opening ---সূর্য্যের জ্যোতি যে নামছে সত্যের জ্যোতি, সে সত্য উর্দ্ধ মনেরও অনেক উপরে''। '' এইরুপ শূন্যতা সাধকের আসে যখন উর্দ্ধের চেতনা নেমে মনপ্রাণকে অধিকার করবার জন্য তৈয়ারী করছে, আত্মার অনুভূতিও যখন হয়, তার প্রথম স্পর্শে একটি বিশাল শান্ত শূন্যতাই হয়, তারপর সে শূন্যতার মধ্যে একটি বিশাল গাঢ় শান্তি, নীরবতা, স্থির নিশ্চল আনন্দ নামে।'' এ নৈর্ব্যক্তিক সত্যভাষণ মাত্র নয়, ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিতেই লেখাটির গুরুতা। কিন্তু ব্যক্তি রয়েছেন যেন ধরাছোঁয়ার বাইরে, জনৈক ইংরাজ সমালোচক সত্যই লিখেছেন, ''ছত্র writes as though he were standing among the stars , with the constellations for his companions. '' (তাঁর লেখা পড়ে মনে হয় যেন তিনি রয়েছেন তারকারাজির মধ্যে, ওরাই তাঁর সঙ্গী।)

শ্রীঅরবিন্দের যোগদর্শন

অনির্বাণ

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর পূর্ণযোগকে কি হিসাবে নতুন বলেছেন তাঁর কথা ধরেই তা আলোচনা করা যাক। তাঁর একখানা চিঠিতে আছেঃ “ এমন কথা আমি কখনও বলিনি যে সব দিক দিয়ে আমার যোগ একেবারে আনকোরা নতুন। আমি এর নাম দিয়েছি পূর্ণযোগ (Integral Yoga) । তার অর্থ, এতে বিভিন্ন প্রাচীন যোগের নিষ্কর্ষ যেমন আছে, তেমনি তাদের অনেক সাধনাঙ্গ এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু পূর্ণযোগের নতুনত্ব হচ্ছে তার লক্ষ্যে, তার দৃষ্টিভঙ্গীতে তার সাধনায় সর্বাঙ্গীনতায়।--- এর আগেও এমন সব আদর্শ বা সম্ভাবনার কথা উঠেছে আপাতদৃষ্টিতে তার সাধনায় সর্বাঙ্গীনতায়। -- এর আগেও এমন সব আদর্শ বা সম্ভাবনার কথা উঠেছে আপাতদৃষ্টিতে যাদের পূর্ণযোগের সগোত্র বলে মনে হয়। যেমন, মানবের সমষ্টিগত সিদ্ধির সাধনা কোনও কোনও তন্ত্রে (ভক্তি ও শক্তির) সাধনা, কোন কোনও যোগী সম্প্রদায়ে পূর্ণাঙ্গ কায়াসিদ্ধির সাধনা ইত্যাদি। আমি নিজেও অনেক জায়গায় এদের কথা তুলেছি এবং এও বলেছি যে মানব জাতির অধ্যাত্ম সাধনায় অতীত যুগ প্রকৃতিরই একটি প্রস্তুতি। তবে কিনা তার লক্ষ্য শুধু লোকাত্তর ব্রহ্ম নির্বাণই নয়, কিন্তু এই পার্থিব চেতনারই একটা দিব্য পরিণাম ঘটাবার জন্য আর এক পা এগিয়ে যাওয়া।-- প্রাচীন যোগপন্থার আদর্শ এবং ভাবনার পুনরাবৃত্তিই (অধ্যাত্ম সিদ্ধির পক্ষে) যথেষ্ট বলে আমার মনে হয়নি। তাই আমি সাধ্যের এমন একটা অবধি নির্দেশ করছি যা এখনও সিদ্ধ হয়নি, যার স্পষ্ট ছবিটি এখনও আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠেনি-- যদিও অতীতের সমস্ত অধ্যাত্ম সাধনায় এটিই যে স্বাভাবিক অথচ আপাতত নিগূঢ় পরিণাম, তাতেও সন্দেহ নাই।

আমার এই যোগ প্রাচীন যোগের তুলনায় নতুন এই জন্য যে ,(১) জগৎ ও জীবন ছেড়ে স্বর্লোকে কি নির্বানে প্রবেশ করা এ যোগের লক্ষ্য নয়। এ-যোগ চায় জীবনের এবং সত্তার রুপান্তর। সে রুপান্তর গৌণ বা আনুষঙ্গিক নয়, সাধনার তা সুস্পষ্ট এবং মুখ্য লক্ষ্য। অন্যান্য যোগেও অবতরনের কথা আছে বটে,কিন্তু যে অবতরণ মোক্ষ , সাধনার আনুষঙ্গিক ব্যাপার, উত্তরণেরই তা (অবান্তর) পরিনাম-- উত্তরনই হল এখানে আসল লক্ষ্য। আর এ যোগে উত্তরণ হল সাধনার প্রথম ধাপ মাত্র অবতরনের জন্যই উত্তরণ। উত্তরণের ফলে নতুন চেতনার অবতরন সিদ্ধ হলেই এ সাধনার সিদ্ধি।

তন্ত্র এবং বৈষ্ণব মতে ভবচক্র হতে নিস্তার পাওয়াই হল সাধনার শেষ কথা। আর এ যোগে জীবনের পূর্ণাঙ্গ দিব্য পরিনাম হল লক্ষ্য।

(২) নিছক ব্যক্তির প্রয়োজনে ব্রহ্মসাধনার ব্যক্তিগত সিদ্ধিলাভই এ যোগের লক্ষ্য নয়। এ চায় এ পৃথিবীতে সমষ্টি চেতনার ইষ্টার্থে একটি সিদ্ধি---শুধু বিশ্বোত্তীর্ণ সিদ্ধিই নয়, একটা বিশ্বগত সিদ্ধি। চৈতন্যের একটা শক্তি (যাকে বলেছি অতি মানস) এখনও পার্থিব প্রকৃতিতে দানা বাঁধেনি বা প্রত্যক্ষভাবে সক্রিয় হয়নি--- এমন কি মানুষের অধ্যাত্ম জীবনেও নয়। এই শক্তিকে নামিয়ে এনে সংহত এবং সোজাসুজি সক্রিয় করে তোলাও পূর্ণযোগের একটা লক্ষ্য।

(৩) এই উদ্দেশ্যে এমন একটা সাধনপন্থা ছকা হয়েছে যা লক্ষ্যের মতই অখন্ড এবং সর্বাঙ্গীন-- যা চায় চেতনা এবং প্রকৃতির অখন্ড এবং সর্বাঙ্গীন রুপান্তর। প্রাচীন সাধনপন্থাগুলিকেও এর অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে বটে-- কিন্তু করা হয়েছে আংশিকভাবে এবং বিশিষ্ট কতকগুলি সাধনাঙ্গের প্রাথমিক সোপানরুপেই। সর্বাংশে এমনিতর বা এর অনুরুপ কোনও সাধনার নির্দ্দেশ বা সিদ্ধির কথা প্রাচীন যোগপন্থাগুলিতে আমি পাইনি। পেলে পরে আজ ত্রিশ বছর ধরে এত গবেষণা, অন্তর্লোকে নতুন কিছু গড়বার এত আয়োজন, নতুন পথ কাটাবার এত পরিশ্রমে সময় নষ্ট করবার আমার দরকার কি ছিল? দিনের আলোয় দিব্যি দুলকি চালে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যেতাম, সান-বাঁধানো সারি রাস্তাতো সামনে পড়েই ছিল, পথের নক্সাও নিখুঁত, রাহাজানিরও কোনও ভয় নাই! আমাদের যোগ পুরানো পথ মারিয়ে চলছে না, চলছে অধ্যাত্মরাজ্যে নতুনের সন্ধানে। ”(Letters.vol.1 pp১৫--২৮)

কথাগুলি খুবই স্পষ্ট। পূর্ণযোগের নতুনত্ব সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের বক্তব্যকে আর একটু বিশদ করলে এই দাঁড়ায়ঃ

এদেশের সব সাধনার লক্ষ্য হচ্ছে মুক্তি বা জন্মান্তর নিবৃত্তি। সাধক চান , আর যেন এ জগতে তাঁকে ফিরে আসতে না হয়। কিন্তু পূর্ণযোগী এটাকে একান্ত বলে ধরেন না। মুক্ত হতে তিনিও চান, কিন্তু মুক্তি তাঁর কাছে অধ্যাত্ম-সিদ্ধির প্রথম পর্ব মাত্র। মুক্তিতে জীবন ফুরিয়ে যাবে না, শান্তিতে আলোয় আনন্দে শক্তিতে আরো উপচে উঠবে। এমনিতর প্রাণের উপচয় প্রমুক্ত চেতনায় সম্ভব। পূর্ণযোগীর তাই কাম্য। সুতরাং মুক্তির পরেও তাঁর জীবনে চলে রুপান্তর সিদ্ধির সাধনা । এই নতুন জীবনায়ন। আকাশের মুক্তি আছেই, কিন্তু সেই আকাশের বুকে প্রাণের নবরুপায়নের অফুরন্ত উল্লাসও আছে। দুটিকে মিলিয়েই সত্তার অখন্ড চরিতার্থতা।

তারপর, এ চরিতার্থতা পূর্ণযোগী একার জন্য চান না, চান সবার

জন্য। ' আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্বিতায় চ' আমাদের সাধনা-- এ কথা পূর্বসুরিরাও বলেছেন। বিশ্ব জুড়ে এক অখন্ড চেতনা। এক অখন্ড প্রাণ, কাজেই ব্যষ্টির সিদ্ধিকে সমষ্টির সাধনা ও সিদ্ধির থেকে পৃথক রাখা যায় না। অধ্যাত্ম সাধনায় চেতনা যতই উর্ধ্বে ওঠে, ততই তা যেমন পরিব্যাপ্ত হয়, তেমনি গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হয়। সুতরাং একের দিব্য ভাবনা বহুর মধ্যে সাড়া জাগাবেই, এ হল প্রকৃতির আইন। কিন্তু দিব্য ভাবনারও রুপভেদ আছে। ' আমি যেমন মুক্ত, তেমনি সবাই মুক্ত হ'ক'--প্রমুক্ত চেতনার এই আকুতিতে দিব্যভাবনার এক রুপ। 'পুরুষের মুক্তি আনুক রুপান্তরিতা প্রকৃতির সিদ্ধি এবং সেই মুক্তি ও সিদ্ধি বিশ্বগত হ'ক',--এই হল দিব্যভাবনার আর এক রুপ। বলা বাহুল্য, এইটিই পূর্ণযোগীর লক্ষ্য। সুতরাং আত্ম মুক্তির পরেও আত্মপ্রকৃতিই রুপান্তর এবং পার্থিব চেতনার মূলাধারে কুন্ডলিত শক্তির উদ্বোধন-- এই দুটি করণীয় তাঁর থেকে যায়। এইখানেই পূর্ণযোগের বৈশিষ্ট্য। তার সম্ভাব্যতা, যৌক্তিকতা, অধিকার এবং পরিণাম নিয়ে প্রশ্নও ওঠে এখানে।

লক্ষ্যের বৈশিষ্ট্য থেকে সাধনাতেও বৈশিষ্ট্য দেখা দেবে, এটা স্বাভাবিক। অথচ অধ্যাত্ম-সাধনা এবং সিদ্ধির মধ্যে পূর্বাপর একটা ধারাবাহিকতা আছে, একথাও স্বীকার করতে হবে। কেননা বিশ্ব যেমন এক অখন্ড চৈতন্যে বিধৃত, তেমনি তার মধ্যে বয়ে চলেছে, এক অবিচ্ছেদ্য প্রাণের ধারা। আবার চৈতন্য এবং প্রাণ (উপনিষদের ভাষায় আকাশ এবং প্রাণ) ওতপ্রোত--- একই সত্তার তারা এপিঠ-ওপিঠ। এটিই হল পূর্ণাদ্বৈতবাদের মর্ম কথা। পূর্ণযোগের সাধনার ভিত্তিও এই দৃষ্টির পরেই প্রতিষ্ঠিত।

সব সাধনার গোড়ার কথাই হল চেতনার মোর ফিরিয়ে দেওয়া, তাকে উজান বওয়ানো। মুখ্যত মন দিয়েই আমরা সাধনা শুরু করি। উজান ঠেলতে এক জায়গায় এসে মন তার গন্ডির শেষে পৌছায়। তার পরে থাকে একটা নির্বিশেষ বিরাট শূন্যতা। অধ্যাত্ম শাস্ত্রে মনের ভাষায় তর্জমা করে একে বলা হয়েছে 'একরস প্রত্যয়'। শূন্যের নির্বর্ণতায় কিছুই সেখানে ঠাহর হয় না। তবু দুঃসাহসীর শ্যেণ চক্ষু তার মাঝে সন্ধানী দৃষ্টির বিদ্যুৎ হানে এবং নতুন কিছুর আভাস পায়। অধ্যাত্ম শাস্ত্রে তার কিছু কিছু বিবৃতি পাওয়া যায়-- বিভিন্ন দর্শনে মোক্ষের বিভিন্ন পরিচিতিতে।

কিন্তু মোটের ওপর মোক্ষের চেহারাটা এক। ও হল পুরুষের অধিকারে, কালাতীত আনন্ত্যের এলাকায় । কিন্তু ঠিক তারই অনুপূরক আর একটা আনন্ত্য আছে -- প্রকৃতির বিভূতির আনন্ত্য। যা কিন্তু কালগত। ' আমি আছি এবং আমি হচ্ছি'-- এদু'টি ভাবনা একই সত্তার যুগ্ম ধর্ম হলেও দুয়ের মধ্যে প্রকার ভেদ আছে। একটিতে কাল নিষ্পদ, আর একটিতে কাল অনবসিত। যদি শুদ্ধ অস্তিত্বে পৌঁছই আর সেখানেই থেকে যাই , সাধনার আর শেষ থাকে না। তখন মুক্তির পরেও সাধ্যের কথা ওঠে। বস্তত, পৌরুষের সত্তা অবিচলতায় নিত্যপ্রতিষ্ঠ হয়ে আছে, কিন্তু প্রকৃতির উর্ধ পরিণাম তো শেষ হয়ে যায়নি। আর এ দুটি নিয়েই জীবনের অখন্ড পূর্ণতা। পূর্ণযোগের সাধনায় দুটিকেই সমান মর্যাদা দেওয়া হয়। তাই অচল প্রতিষ্ঠা পুরুষের নিবৃত্তি আর অনন্ত পরিনামিনী পরমা-প্রকৃতির প্রবৃত্তির--পূর্ণযোগীর জীবনে এ-দুয়ের একটা সামঞ্জস্য ঘটে। চিৎ-প্রতিষ্ঠা আর চিৎ-পরিণাম দুই-ই তাঁর কাছে সমান সত্য। অথচ দার্শনিক বিচারে আমরা সাধারণতঃ চিৎকে স্বপ্রতিষ্ঠার মর্যাদা দিয়ে পরিণাম-ধর্মকে ফেলি জড়ের কোঠায়। এইটিই প্রচলিত সাংখ্যসিদ্ধান্তের অনুকূল এবং লোকায়ত বেদান্তের উপর তার অসামান্য প্রভাবও পড়েছে। অবশ্য আমাদেরই দেশের দার্শনিক ভাবনায় এর প্রতিবাদ আছে। মীমাংসায় , তন্ত্রে, ভগবতধর্মে প্রকৃতির শুদ্ধ পরিণামের কথা আছে। এ সমস্ত ভাবনাই পূর্ণযোগের সাধনার দার্শনিক ভিত্তি। পূর্ণযোগের ব্যঞ্জনাকে পুরোপুরি ধারণা করতে হলে অতীত যুগের পরিপ্রেক্ষিতেও তাকে বিচার করতে হবে, কেননা এ-যোগ প্রাচীন যোগের পুনরাবৃত্তি না হলেও তার অবিচ্ছেদ্য অনুবৃত্তি প্রবহমান প্রকৃতি-পরিণামের দৃষ্টিতে এইখানে তার নতুনত্ব।

দায়বদ্ধতা

শ্রী অশোক রায়

(শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পন্ডিচেরী)

দায়বদ্ধতা ! এই শব্দটি এমন যে এর ‘অর্থ ’ খুঁজতে গিয়ে নুনের পুতুলের সাগরের জলের গভীরতার খোঁজ নেওয়ার মতো। কিন্তু এই লেখা’র ছবিটি যে সম্পাদক মহাশয়ের দেওয়া ফ্রেমের মাপ অনুযায়ী হতে হবে। এই ব্রহ্মান্ড ও অগুনতি গ্রহ নক্ষত্র সবই একটি অনাবিষ্কৃত কিন্তু সাধনলব্ধ জ্ঞানের দ্বারা বিশ্বাসের ভিত্তিতে --যাঁকে সুপ্রীম ক্রিয়েটর বলা হয়ে থাকে। তাঁরই নিয়মের দায়বদ্ধতার পারস্পরিক সাম্যের ফলে , একে অপরের থেকে আনুপাতিক দূরত্ব বজায় রাখার একটা মহাজাগতিক ‘ভারসাম্য’ রয়েছে।

দায়বদ্ধতার আরেকটি অতি সূক্ষ্ম প্রকাশ ‘ভারসাম্য’ (অন্যত্র এই প্রসঙ্গে লেখার ইচ্ছে রইলো) । আমাদের দৃশ্য এই জগৎ সংসারে সমস্ত কিছুর অভ্যন্তরে ব্রহ্ম বিরাজমান। অন্য ভাষায় ইভেন ইন এভরি স্মলেস্ট পার্টিকেল অফ অবজেক্ট হোয়েদার লিভিং অর নন লিভিং এটম ডু এক্সিসটস । শঙ্কারাচার্যের মতে,‘ একমাত্র ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা ঃ’ চেতনার সেই স্তরে উত্তরন ঘটলে তবেই এই সত্যকে প্রত্যক্ষ করা যায়। ততদিন পর্যন্ত ‘ যেমন ব্রহ্ম সত্য তেমনই তারই প্রকাশ এই জগৎও সত্য, শুধু মায়ার চাদরে মোড়া।

পৃথিবীর ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উত্তরিত চেতনার আলোকে আলোকিত মহাপুরুষ , অবতাররা এসেছেন এবং সেই সময়ে পৃথিবীর চেতনার ধারণশক্তি অনুযায়ী তাঁদের সাধনলব্ধ চেতনাকে বিতরন করে যাওয়াটা তাঁদের দায়বদ্ধতা ছিল। সেই সব ঋষি, মুনি এবং অবতারদের দ্বারা প্রভাবিত অগণিত ভক্ত, শিষ্য , অনুগামীদের কর্তব্য এবং দায়বদ্ধতা নিজের জীবনকে আলোকিত করা । শুধুমাত্র নিজেকে আলোকিত করলে চলবে না। আমরা বাস করি এক বিশ্ব সংসারে এবং খুব মজার বিষয় হলো এটা প্রকৃতি মায়ের একটি মাল্টি কন্টিনেন্টাল হোটেল। যেখানে ইডলি, ধোসা থেকে স্নেক স্যুপও পাওয়া যায়। একে অপরের সাথে নানা রুপে ও ভাবে যুক্ত থাকাটা আমাদের সামুহিক দায়বদ্ধতা। যেমন চাষী ভাই ফসল ফলাচ্ছেন, সেই ফসল নানা পদ্ধতির মাধ্যমে আমাদের মুখে অন্ন হিসাবে গৃহীত হচ্ছে। শিক্ষক-ছাত্রকে শিক্ষা দান করছেন, ছাত্র সেই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে জীবন যুদ্ধে নামছে। পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা, স্বামী-স্ত্রী এই সমস্ত সম্পর্কের মধ্যেও দায়বদ্ধতা রয়েছে। যারা রাজনীতি করছেন আম জনতাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা তাদের দায়বদ্ধতা। যদি আমরা আমাদের দৃষ্টি প্রসার করি তাহলে দেখতে পাবো প্রকৃতি সৃষ্ট সমস্ত জীবজগতের সাথে প্রত্যক্ষ- অপ্রত্যক্ষভাবে আমরা দায়বদ্ধ। তাই বলা হয়েছে যত জীব তত শিব।

ইভলিউশনের প্রসেসে একটি বিস্ফোরন ঘটেছে। পরিণতি হিসেবে দেখা যাচ্ছে আজ হতে ৫০/৬০ বছর পূর্বে ৫/৬বছরের শিশুর বুদ্ধির বিকাশ আর এই ২০২২ সালের ৫/৬ বছরের শিশুদের বুদ্ধি কতটা এগিয়ে তারজন্য কোনো উদাহরনের প্রয়োজন নেই। একবার একটি প্রশ্নের উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন, ‘ যে আমার কিছু করার নেই। শ্রীকৃষ্ণ যে কাজটি করেননি আমি সেই কাজ করছি। এবং এর জন্য বলা হচ্ছে আমি কৃষ্ণের থেকেও এগিয়ে। এ সবই নিরর্থক কথা।” শ্রীকৃষ্ণ করেননি কারণ পৃথিবীর গ্রহন সামর্থ্য অর্থাৎ আধার প্রস্তুত ছিলো না। এটা জানা কথা প্রস্তুতির পূর্বে আধারে ‘কিছু’ রাখলে আধার ধরে রাখতে পারবে না।

সব শেষে বলি যে যেখানে যাঁর দ্বারা প্রভাবিত (শ্রীরামকৃষ্ণ, যীশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ এবং সবশেষে শ্রীঅরবিন্দ) পথে চলার জন্য চেষ্টা করছেন। সবাই ব্যক্তির উন্নতি(জাগতিক এবং পারমার্থিক) সাথে সাথে পরিবার, সংঘ , দেশ, রাষ্ট্রের প্রতিও দায়বদ্ধ হউন। তবে সাবধান দল ভারী করার প্রবণতাকে দৃঢ়তার সাথে ত্যাগ করতে হবে। কোনোমতেই ব্যক্তি স্বাধীনতাকে খর্ব করা যাবে না। জীবে-জীবে শিব এক হলেও বস্তুত জীব শক্তি ভিন্ন ভিন্ন। পারমার্থিকও সত্য , ব্যবহারিকও সত্য। কিন্তু অন্যরকম। ব্যবহারিক সত্য জগৎ ভেদের ব্যাষ্টি সত্তার উপরে প্রতিষ্ঠিত।

আগামী ১৫ই আগস্ট শ্রীঅরবিন্দের সার্ধ শত জন্মবার্ষিকী। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত শ্রীঅরবিন্দ দর্শনকে ব্যাষ্টি ও গোষ্ঠীগতভাবে অনুসরন করার জন্য বিভিন্ন কেন্দ্রগুলোতে অনেক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণ যোগের প্রধান কথা হলো -- মানুষ ইভলিউশনের শেষ কথা নয়। এর পরের ধাপ ‘ দেবমানুষ’ এবং সেই স্তরে উন্নীত হওয়ার জন্য সম্পূর্ণ নতুন চেতনা শক্তির প্রয়োজন। সেই নব চেতনা শক্তিকে অবতরন করার জন্য শ্রীঅরবিন্দ দধীচি মুনির ন্যায় নিজেও মানবদেহকে উৎসর্গিত করে গেছেন। পৃথিবীর ‘আধার ’ তখন প্রস্তুত ছিল না। শ্রীঅরবিন্দকে অনায়াসে বলা যায় আর্কিটেক্ট অফ নিউ এজ কনসাসনেস।

যাঁরা শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণ যোগ সম্বন্ধে জানতে উৎসাহী তাদের জন্য রইলো কিছু গ্রন্থাবলীর সঙ্কেত -- কারাকাহিনী, উত্তরপাড়া অভিভাষন, মা, নিজের কথা, গীতা নিবন্ধ, যোগ সমন্বয়, তাঁর লেখা অমূল্য পত্র সংগ্রহাবলী, দিব্য জীবন এবং সাবিত্রী। ‘সাবিত্রী ’ মুক্তছন্দে লেখা এক অনবদ্য অনুপম সৃষ্টি। এটা একটি এপিক যা চব্বিশ হাজার লাইনে শেষ হয়েছে। সাবিত্রী শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণ যোগের সাঙ্কেতিক পথ নির্দেশিকা। ভবিষ্যতে যদি এই অধম কৃপা লাভ করে, তাহলে ‘সাবিত্রী’ মহাগ্রন্থের বিষয়ে কিছু অনধিকার চর্চা-র ---চর্চা করার ইচ্ছে রইলো।

জয়স্তঃ পরমেশ্বরঃ । জয় হোক অগণিত ভক্তবৃন্দের, জয় শ্রী মা শ্রী অরবিন্দের।

সমাধান

- ধীময়ী

সমাধির কাছে গেলে হয়ে যায় সব সমাধান,
থাকে না কোনও প্রশ্ন, কোনও উত্তর,
ডানদিক, বাঁদিক সব সমান।
শূন্যতা নেই কোথাও, আছে গভীর আস্থা
শুধু এক পূর্ণ স্তব্ধ মিলন।
আর সমাধিকে স্পর্শ করলে,
অন্তরে বয় শান্তিবারি
ভুলে যাই জয়-পরাজয় ,
গ্লানি,হতাশা, মান-অপমান।
নিশ্চিন্ততার দীর্ঘ এক হাত, ছোঁয় আমার মাথা।
আমার চোখ ভাসে জলে,
নীরবে বসে দেখি চারিদিকে নীল আলো।
মনে হয় যেন অমৃত সাগরে ডুব দিয়েছি,
যার তল নেই, নেই কিনারা
যেন অথৈ জলে তাথৈ নৃত্য,
পরমানন্দে বিহ্বলচিত্ত।
আমি আকণ্ঠ পান করি সেই অমৃত
আর হয়ে যাই অমৃতস্য পুত্রী।

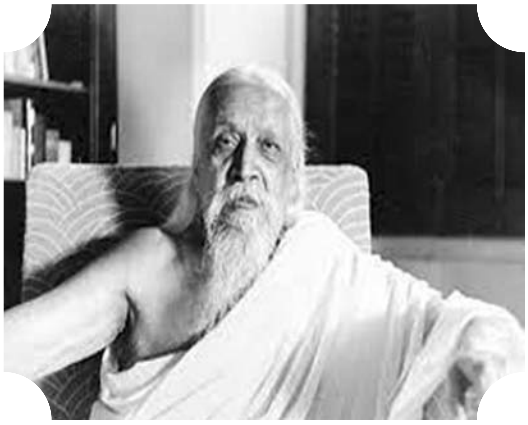

সবাই আমার বন্ধু

- ধীময়ী

আকাশের রবির সাথে হাসি আমি
বৃষ্টির সাথে কাঁদি
বাতাসের বেগে ছুটে চলি আমি
আমি এক আহ্লাদি।
পাহাড়ের সাথে মনে মনে করি মৌনী বাক
প্রতি পলে পলে মধুর পরশে হই অবাক!

সাত সাগরের অতল তলে সাত রাজার ধন
আমি রাখি গভীর জলে নিজ অরুপ রতন।

দিবারাতি কোষে কোষে সবার ভালোবাসা,
বেঁধেছি তাই বকুল শাখে ছোট একটি বাসা।

তারার আলায় বাসা আমার সদা হাসির কুটীর,
চাঁদ সোহাগী এলে পরে, আসে রাজী উজীর।

পরম বন্ধু অন্তরাত্মা, চৈত সত্তাও বটে
তবু কেন পথে-ঘাটে অঘটনও ঘটে।

মানব দেহে কেহ যখন, দেয় মোরে গালি,
মনে মনে তারেই আমি , করি কোলাকুলি।

আকুল হয়ে বলি আমার পরম দোসরে
দাও না তারে আলোর বাণী ভোলাও কু-স্বরে।
এত বন্ধু আমার তবু আরও বন্ধু চাই।
সুখে দুখে হেসে খেলে আপন ভোলা তাই।

পরম বন্ধুর পরম প্রেমে পাই হাজার বন্ধু,
এও তোমার দান, ওগো অধমের দীনবন্ধু।

শ্রীঅরবিন্দ ঃ সার্ধশতবর্ষ ফিরে দেখা

রোমি সাহা

দেখতে দেখতে সময়ের পাকদন্ডী বেয়ে চলে এল শ্রীঅরবিন্দের জন্মের সার্ধশতবর্ষ। ১লা জানুয়ারি থেকে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত আমাদের দেশ তথা বিশ্ব শ্রীঅরবিন্দ সার্ধশতবর্ষ উৎসব পালন করতে চলেছে। প্রশ্ন আসে,কীভাবে সফল করে তুলব আমরা এই উৎসবকে? সে কি কেবলই একটা অনুষ্ঠান? একটা বাহ্যিক আড়ম্বর মাত্র অনলাইন বা অফলাইনে! উৎসবের বোধন তো সবার আগে হওয়া চাই আমাদের জীবনে, আমাদের অন্তরাত্মায়, আমাদের চেতনায়, আমাদের প্রতিদিনের কর্মের মধ্যে। কিছু দিন তাঁকে স্মরণ করলে বা কয়েকটা দিন তাঁর বই পড়লে হয়তো তাঁর অনুসারী বা মতবাদী হওয়া যায়। অর্থাৎ তাঁর মতটা আমাদের ভালো লাগে, কিন্তু তাতে তো তিনি জীবনে আসেন না। তাঁর মতে নিষ্ঠা জন্মায় না, নিষ্ঠা আসে বোধ থেকে। মতকে নিজের ভেতরে ঢালতে হয় এবং তা শুধুমাত্র পড়েই হয়ে যায় না। পড়া সহায়ক হতে পারে মাত্র। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর স্বচ্ছতা নির্ভর করে না আমরা কার অনুসারী, কাকে জেনেছি বা পড়েছি তার ওপর। নির্ভর করে কত বড়ো মূল্য আমরা দিয়েছি। জ্ঞানকে জীবনে কিভাবে ঢেলেছি। মূল কথা হল, কী কী ছেড়েছি আমরা মহত্তমের জন্য? উচ্চতমের জন্য?

এক মহাজীবনের পরিক্রমা--১৮৭২ থেকে ১৯৫০ । ১৮৭২ সালের ১৫ই আগস্ট ভোর ৪.৫০ মিনিটে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন শ্রীঅরবিন্দ। এরপর ৫ থেকে ৭ বছর বয়স পর্যন্ত দার্জিলিং-এ শিক্ষার জন্য অবস্থান। ১৮৭৭-৭৯ সাল। ৭--২১ বছর ১৮৭৯--১৮৯২ ইংলন্ডে শিক্ষার জন্য অবস্থান। এরপর বরোদায় চাকরি জীবন ১৮৯৩-১৯০৬ সাল। ১৯০১ সালে শ্রীভূপালচন্দ্র বসুর কন্যা মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ। ১৯০২ সালে ভগিনী নিবেদিতার বরোদায় আগমন বরোদা-মহারাজের আমন্ত্রণে। সাক্ষাৎ হয় শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে। ১৯০৬ সালের ১৪ই এপ্রিল বরিশালে কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদান। কলকাতায় রাজনৈতিক জীবন ১৯০৬-১৯০৮ সাল। আলিপুর জেল জীবন ঃ ৮ইমে ১৯০৮-৬ই মে ১৯০৯, এক বৎসর কারাবাসে বাসুদেব দর্শন। কলকাতায় অবস্থানকালে কর্মযোগীন ও ধর্ম পত্রিকার প্রকাশ --৬ই মে ১৯০৯-ফেব্রুয়ারী ১৯১০। ৪ঠা এপ্রিল 'দুপ্লে'জাহাজে কলকাতা থেকে পন্ডিচেরি আগমন ! শুরু হল সাধন জীবন ঃ পন্ডিচেরিতে অবস্থান ১৯১০ থেকে ১৯৫০ । ১৯১৪ সালের ২৯শে মার্চ শ্রীমা সাক্ষাৎ করেন শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে। ১৫ই আগস্ট 'আর্য' পত্রিকা প্রকাশ। ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি পন্ডিচেরিতে শ্রীমায়ের প্রথম জন্মদিন পালন। ১৯২০ সালের ২৪শে এপ্রিল শ্রীমায়ের পন্ডিচেরিতে পুনরাগমন। ১৯২৬ সালের ২৪শে নভেম্বর শ্রীঅরবিন্দের সাধনায় অধিমানসের (overmind) অবতরন। এই দিন থেকেই শ্রীমা শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের সম্পূর্ণ দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। শ্রীঅরবিন্দ লোকচক্ষুর অন্তরালে একান্তে সাধনায় মগ্ন হলেন। ১৯২৭-৫০ শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের বিভিন্ন কর্মের উত্তরোত্তর বিকাশ ও বিস্তার। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিনে ভারতের স্বাধীনতা লাভ। জাতির উদ্দেশ্যে শ্রীঅরবিন্দের বিখ্যাত বাণী। ১৯৫০-এর ৫ই ডিসেম্বর শ্রীঅরবিন্দের মহাসমাধি।

এই বছর ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ৭৫ বছর। শ্রীঅরবিন্দ এবং ভারতবর্ষ --এ দুই-ই যেন সমার্থক। ভারতবর্ষকে সঠিকভাবে জানতে পারলে শ্রীঅরবিন্দকে জানার অভীপ্সা জন্মায়। আর শ্রীঅরবিন্দকে জানতে পারলে আন্তরিক ভারতকে চেনা ও জানার পরিধি বাড়তে থাকে। সেই জন্যেইতো একই দিনে স্বদেশ এবং স্বদেশ আত্মার বাণী মূর্তি শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিন। প্রতি বছরই এই দুটো তিথিকে আমরা একসঙ্গে পাই। এটা কোনও আকস্মিক বা হঠাৎ যোগাযোগ নয়। স্বাধীন ভারতের প্রথম জন্মলগ্নে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর বাণীতে বলেছিলেন, এই যোগাযোগকে " আমি আকস্মিক যোগাযোগ বলিয়া গ্রহণ করি না। তাহা হইল, যে-কাজ লইয়া আমি আমার জীবন শুরু করি তাহাতে ভগবদ শক্তির সম্মতি ও ভগবানের অনুমোদনসূচক আশীর্বাদ।" তাঁর কাছে তো ভারত ভৌগলিক সীমানা মাত্র নয়, এক জাগ্রত মাতৃস্বরুপা। তিনি বলেছেন,'আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি।'তাঁর জীবনসাধনার প্রথম কথাই হল এই দেশ ভারতবর্ষ।' My country first ,humanity afterwards and the rest nowhere' --এই ছিল তাঁর স্বপ্ন ও সাধনা।

এখন আমরা কিভাবে দেখি ভারতকে? অনেকে আবার ভারত বললে ভারতের মানচিত্র দেখিয়ে দেয়। কিন্তু এই মানচিত্র তো বরাবর এক থাকেনি। হয় কমেছে না হয় বেড়েছে। দেশ হয় রাজনৈতিক বা ভৌগলিক সীমার ওপর ভিত্তি করে। রাষ্ট্র হয় আদর্শের ওপর ভিত্তি করে। ভারত কখনোই একটি সীমানাবদ্ধ ভূখন্ড নয়।দেশ বা সমাজ গঠিত হয় কিছু সাধারণ স্বার্থকে কেন্দ্র করে। ভারত কী দিয়ে গড়া? উপনিষদের কেন্দ্র দিয়ে। 'মদাত্মা সর্বভূতাত্মা বসুধৈব কুটুম্বকম'-গাঁথাই হয়েছিল, আত্মাকে কেন্দ্র করে। আর কোনও ভিত্তিই ছিল না আমাদের। মানুষ মাত্রই অপূর্ণ। তার পূর্ণত্ব চাই। এই পূর্ণত্ব কীভাবে পাব--তার গভীর, গভীরতম মানবভূমিকে কর্ষণ করে একজোট হয়েছিল যে জাতি তার নাম ভারত। 'এমন মানবজমিন রইল পতিত, আবাদ করলে ফলত সোনা'--রামপ্রসাদের গানেও তার প্রকাশ। জাগতিক অর্জনকে সে কখনও মুখ্যতা দেয়নি। শারীরিক, সামাজিক স্তরে কষ্ট স্বীকার করেছে, কিন্তু চেতনার ঊর্ধ্বগতিকে গুরুত্বহীন হতে দেয়নি।

শ্রীঅরবিন্দ কারাগারে বন্দি (আলিপুর জেল) থাকাকালীন তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হত উপনিষদের মন্ত্র। সর্বভূতে, সর্ববস্তুতে ভগবদ-দর্শনের আকুল আগ্রহ নিয়ে সেই মন্ত্র ধ্বনিত হত অন্তরের অন্তঃস্থল হতে। তিনি দেখলেন মানুষ গাছপালা-মাটি-ধুলো প্রতি বস্তুতে তিনিই একমাত্র আছেন। সর্বভূতে বিরাজমান। কারাগার হয়ে উঠল স্বর্গপুরী, তাঁর প্রেমাস্পদের নিবাসভূমি।

তিনি বার বার বলেছেন, ভারতের মুক্তি না হলে পৃথিবীরও মুক্তি নেই। সমগ্র জগতের সঞ্চিত তপস্যার ভূমি এই দেশ। সারা পৃথিবীর ভবিষ্যতের প্রতীক হল ভারতবর্ষ। এই দেশ জগতের শক্তিপীঠ। তাই তাঁর জীবনব্রত শুরু হল- ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনের ভেতর দিয়ে। রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে তাঁর আবির্ভাব শুধুমাত্র রাজনীতিবিদ হিসেবে নয়। তিনি এসেছিলেন 'দেশপ্রেমের কবি, জাতীয়তাবাদের নবী এবং মানবপ্রেমিক' হিসেবে। সেইসঙ্গে একজন প্রচ্ছন্ন যোগী ও মানবত্রাতা হিসেবেও। এসেছেন 'দেবতার দীপ হস্তে স্বদেশ আত্মার বাণীমূর্তি' নিয়ে। রাজনীতি তাঁর কাছে কখনোই রাজনীতিমাত্র নয়, আধ্যাত্মিক সাধনা। সে যুগের স্বদেশি আন্দোলনে যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁরা এই সত্যই উপলব্ধি করেছিলেন। জীবন ও যোগ আলাদা ছিল না তাঁর কাছে। জীবনকে তিনি বরাবর অধ্যাত্ম চেতনার ভেতর দিয়ে দেখেছেন। তাঁর কথায়--' a yoga which required me to give up the world was not for me ' --জীবন ও জগৎ ত্যাগ করে যে সাধনা তা আমার নয়। তাই তিনি একান্ত সাধনায় নিবিষ্ট হয়েও জগতের কোথায় কী ঘটছে, ভারতের কী হচ্ছে সেদিকে সবসময় তাঁর তীক্ষ্ন নজর থাকত। প্রয়োজনে আধ্যাত্মিক শক্তি ও যোগক্রিয়ার দ্বারা সেখানে হস্তক্ষেপ করতেন। আমরা জানি, শারীরিক কর্মশক্তির চেয়ে যোগীর যোগশক্তি অনেক বেশি শক্তিশালী। সহস্র নারায়ণী সেনা তুচ্ছ হয়ে যেত শ্রীকৃষ্ণের নীরব উপস্থিতির কাছে।

শ্রীঅরবিন্দের কাছে ভারতবর্ষের তপস্যা, ভারতবাসীর জীবনধারণ ভগবানের জন্য, জগতের জন্য , সমগ্র মানবজাতির জন্য। তিনি যে পাঁচটি স্বপ্ন দেখেছিলেন তা হল --ভারতের মুক্তি, এশিয়ার মুক্তি, আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে সমগ্র মানবজাতির মুক্তি। আর সেই মুক্তিযজ্ঞে ভারত হবে কান্ডারি, পথ প্রদর্শক। সবশেষে ঊর্ধ্বতর চেতনায় মানুষের উত্তরণ--মানবজীবন থেকে দিব্যজীবন বা Life Divine --এই ছিল তাঁর সমগ্র জীবনের সাধনা ও সিদ্ধি।

কিন্তু জনমানসে অধ্যাত্ম কোথায়? যা আছে তাও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভন্ডামি, কুসংস্কার আর ফাঁকা আওয়াজ। উচ্চতম মূল্যবোধ যা কিছু আছে সমাজে আজ তা চরম উপেক্ষিত। বিদ্যার কোনও কদর নেই। sir,boss কাকে বলি আমরা? বিদ্বান ব্যক্তিকে নয়, বিদ্যার ভিত্তিতে নয়, গুণের বা জ্ঞানের ভিত্তিতেও নয়--আমরা আত্মসাৎ করতে পারব যত, তত বেশি সমাজের মাথায় বসতে পারব। গায়ে যত দামি কোট থাকবে, পকেটে যত রেস্ত থাকবে, যত বড়ো গাড়ি থাকবে, যত নামধারী বংশপরিচয় হবে-- আর্থিকভাবে যত উদরপূর্তি হবে তত বেশি sir আর boss উপাধি পাওয়া যাবে। সত্যের থেকে সুবিধার দাম আজ অনেক বেশি। শ্রদ্ধা, অনুশাসনের থেকে স্বেচ্ছাচার অনেক বেশি শক্তিশালী আজ। সংযম এখন হাসির খোরাক। পুরো সমাজ এই মূল্যবোধে দাঁড়িয়ে আছে।

ভারতকে বাঁচতে হলে ও উন্নত হতে হলে তাকে মূল্যবোধের গোড়ায় ফিরতে হবে। আর তা একমাত্র দিতে পারে অধ্যাত্ম। ভিত্তি হল বেদ, উপনিষদ, গীতা, বেদান্ত। স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ বুঝেছিলেন কিন্তু আমরা তাঁদের বুঝিনি। শুধু বই পড়ে স্বাধীনতা যোদ্ধা জন্মায় না, এই অধ্যাত্ম জীবনবোধ থেকে এসেছিল। ভারত যদি অধ্যাত্ম হারায় জগৎ বিশাল দৈন্যের মুখোমুখি হবে। সত্যই ভারতের ভিত্তি। তার পূজা যদি ভারতে না হয় শুধুমাত্র ভৌগোলিক সীমাকে বাঁচিয়ে ভারতকে বাঁচানো যাবে না। সব দেশ একত্রিত হয়েছে কোনও না কোনও প্রাকৃতিক স্বার্থে। ভাষার ভিত্তিতে নয়, সুবিধার ভিত্তিতে। ভারত একমাত্র দেশ যে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বলে একত্রিত হয়েছে । এই মূল লক্ষ্য থেকে দূরে সরে গিয়ে এখন আমরা মোটা দাগের স্বার্থ নিয়ে মেতে আছি। প্রযুক্তির উন্নতি হচ্ছে খুব ভালো-- কিন্তু কার জন্য? কে আমি? 'কোহম'-- এই প্রশ্ন তো বেদান্ত করে। অর্থাৎ আন্তর বিজ্ঞানকে কখনোই ভুললে চলবে না। এত চেষ্টা করেও বিশ্ব উষ্ণায়ন, জনবিস্ফোরণ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না কেন? কার জন্য এই সব? যদি বলা যায় সমাজের প্রতি দায়িত্ব, তাহলে ঘুরেফিরে

সেই একই প্রশ্ন-- কার সমাজ? দায়িত্ব কার? দায়িত্ব কাকে বলে? -- এসব আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়। কারণ আমি কে সেটাই তো জানা নেই, যার ওপর ভিত্তি করে সমাজ হবে, দায়িত্ব বোধ তৈরি হবে। কেন নেব আমি দায়িত্ব সেটাই স্পষ্ট নয়। যদি কেউ নিজেকে না চেনে সে নিজের ধ্বংস অজান্তেই করবে এবং এই শক্তিকে সে নিজেরই সর্বনাশ করতে ব্যবহার করবে, যা আজকে ব্যষ্টি থেকে সমষ্টি সকলে করছে। আর এই প্রশ্নেই আমাদের ত্রস্তু বা অহংকে প্রশ্ন করা যায় । অর্জুন বিজয়ী, ধার্মিক এই জন্য যে সে যুদ্ধ করেছিল, লড়েছিল ধর্মের পক্ষে। অর্জুন অহং ছাড়তে পেরেছিল বলেই যুদ্ধ করতে পেরেছিল। নইলে দেহ, মন তো বলে-- ও আমার গুরু, জ্যাঠা, কাকা, ভাই-- আমি মারতে পারব না। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, অর্জুন, তুমি অহং ছাড়ো। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে তখন আধ্যাত্মিকতা শেখালেন।

এই ঘোর অমানিশায় জনহিতে আত্মোৎসর্গকারী অধ্যাত্মচেতনার অগ্রদূত শ্রীঅরবিন্দকে আজ আমাদের বড়ো প্রয়োজন। তিনি আমাদের অন্তরের যে তপোময় বীজ তার আদিমূলকে ধরে মানুষকে উজ্জীবিত করবেন। তাকে নিম্নচেতনা থেকে দেবভাবে নিয়ে যাবেন। মানুষের এই চূড়ান্ত বিপ্লবের কান্ডারি হলেন শ্রীঅরবিন্দ। তাঁর সার্ধশতবার্ষিকীতে সৃষ্টি আজ অপেক্ষা করে আছে। তাঁরই ভাষায় বলি ‘ Awaiting a tremendous Dawn of God ’। প্রণাম তাঁকে।

আমার চোখে শ্রীঅরবিন্দ

রুপকথা চট্টোপাধ্যায়
(অষ্টম শ্রেণী, লেকটাউন, শিলিগুড়ি)

ভারতের বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী অরবিন্দ ঘোষ ১৮৭২ সালের ১৫ আগস্ট কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ একজন নামকরা বিলেত-ফেরত চিকিৎসক ছিলেন। তাঁর মায়ের নাম স্বর্ণলতা দেবী। তাঁর বাবা ছেলেদের সাহেবিয়ানায় মানুষ করার জন্য মাত্র সাত বছর বয়সেই অরবিন্দকে দার্জিলিঙে সেন্ট পলস স্কুলে ভর্তি করেন যাতে সে সাহেবদের সঙ্গেই পড়াশোনা করতে পারে। কিন্তু দু'বছর পরেই তিনি তাঁর ছেলেদের নিয়ে পড়াশোনার জন্য বিলেতে চলে যান। সেখানে পড়াশোনার পরে ১৮৯০ সালে শ্রীঅরবিন্দ আই সি এস পরীক্ষায় পাশ করেন কিন্তু ঘোড়ায় চড়তে পারেননি বলে তাঁর আর চাকরি করা হয়নি। মাত্র উনিশ বছর বয়সে তিনি বাবাকে হারান।

তখন চাকরির খোঁজে তিনি ভারতে চলে আসেন এবং বরোদায় মহারাজ গায়কোয়াড়ের সচিব হিসেবে কাজ শুরু করেন। পাশাপাশি স্থানীয় স্টেট কলেজে তিনি অধ্যাপনার কাজ করতে থাকেন। সেই সময়ে পরাধীন ভারতে মুক্তিকামী বিপ্লবীদের উপর ব্রিটিশ সরকারের অসহ্য নির্যাতনে তিনি ব্যথিত হয়ে পড়েন। সেইজন্য ছোট ভাই বারীন্দ্রকুমারকে ১৯০২ সালে বিপ্লবী দল গড়বার জন্য বাংলায় পাঠিয়ে দেন। তাদের পাশে দাঁড়িয়ে সশস্ত্র বিপ্লবের অংশীদার হয়ে পড়েন এবং চৌদ্দ বছর কাজ করার পর ১৯০৫ সালে তিনি কলকাতায় চলে আসেন এবং বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগদান করেন। ব্রিটিশরা তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্য তৎপর হয়ে পড়ে। পরে ১৯০৮ সালে মুরারিপুকুর বোমার মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করে আলিপুর জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

জেলে বসে তিনি নিজেকে আধ্যাত্মিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। দেশবন্ধু চিত্ত রঞ্জন দাশের অসাধারণ ওকালতির ফলে তিনি জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন।

জেল থেকে মুক্তি পেলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী অরবিন্দ ঘোষের পরিবর্তে ঈশ্বর প্রেমে নিমগ্ন মানবপ্রেমিক শ্রীঅরবিন্দ। পুলিশের অত্যাচারের ভয়ে তিনি কলকাতা ছেড়ে ফরাসিদের অধিকৃত পন্ডিচেরিতে আশ্রম তৈরি করেন এবং পুরোপুরিভাবে ঈশ্বরের সাধনায় মগ্ন হয়ে পড়েন। ভারতবর্ষ এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ শান্তির জন্য ও মানবধর্ম পালন করার জন্য তাঁর পাশে এসে দাঁড়ান। সেখানেই ১৯৫০ সালের ৫ই ডিসেম্বর তিনি পরলোকগমন করেন। কিন্তু তাঁর কাজের জন্যে তিনি আজও অমর। প্রতি বছরই ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের উৎসব পালনের পাশাপাশি তাঁর জন্মদিনও যথাযোগ্য মর্যাদায় ভারতের প্রায় সর্বত্রই পালন করা হয়।

আত্মার উন্নতিতেই স্বাধীনতার সার্থকতা

কবিতা বণিক
(মহানন্দা পাড়া, শিলিগুড়ি)

বাংলার হুগলি জেলার কোন্নগর এর নামকরা ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষাধারার অনুরাগী। রাজনারায়ন বসুর কন্যা স্বর্ণলতা দেবীকে বিবাহ করেন। এই রাজনারায়ন বসু, ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক ও বিশিষ্ট এক সমাজ নেতা। কৃষ্ণ ধন ঘোষের তৃতীয় সন্তান শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ যিনি পড়ে ঋষি অরবিন্দ নামে জগৎ বিখ্যাত হয়েছেন। কৃষ্ণধন ঘোষ খুব দৃঢ় চেতা ও অনমনীয় মানুষ ছিলেন। কোন কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দিতেন না। রক্ষণশীল সমাজের বিধি নিষেধ অগ্রাহ্য করে চিকিৎসা বিদ্যার উচ্চতর ডিগ্রি লাভের জন্য বিলেতে যান। পড়াশোনা শেষে দেশে ফিরলে সমাজ নেতারা তাকে প্রায়শ্চিত্ত করার কথা বলেন। আরো বলেন না করলে তাকে সমাজ থেকে বহিষ্কার করা হবে। অনমনীয় কৃষ্ণ ধন ডাক্তার অন্ধ কুসংস্কারের জালে পড়বেন না, তাই এক ব্রাহ্মণকে একরকম দান করার মতো যৎ সামান্য মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করলেন কোন্নগরের বাসভবন। চিরদিনের মতো কোন্নগরের পাট চুকিয়ে উত্তরবঙ্গে সরকারি চাকরি নিয়ে চলে আসেন। সে সময় সেই এলাকার মানুষ খুব ম্যালেরিয়ায় ভুগছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন ওই এলাকার একটি বদ্ধ মজা খাল হল ম্যালেরিয়ার উৎস। সে সময় মানুষের দুঃখে তার প্রাণ কেঁদে উঠেছিল। সরকারি ব্যবস্থার উপর নির্ভর না করে ওই খাল সংস্কারের জন্য কয়েক হাজার টাকা দান করেন। ফলে তাকে ঋন গ্রস্ত হতে হয়। শ্রীঅরবিন্দ পিতার এই মহানুভবতা ও পরদুঃখ কাতরতায় অভিষিক্ত হন। কৃষ্ণ ধন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য অরবিন্দকে পাঁচ বছর বয়সে দার্জিলিংয়ের ইংরেজি স্কুলে পড়তে পাঠান। তারপর সাত বছর বয়সে দুই দাদার সাথে ইংল্যান্ডে পাঠানো হয়। সেখানে অসাধারণ মেধা ও বিরল প্রতিভার পরিচয় দেন বালক অরবিন্দ। ইংরেজি ফার্সি ইতালীয় ও জার্মান ভাষায়ও তার দক্ষতা জন্মে। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি নিয়ে কিংস কলেজে ভর্তি হন। মাত্র ১৮ বছর বয়সে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষায়ও তিনি গ্রীক, ল্যাটিন ও সাহিত্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। কিন্তু সিভিল সার্ভিসে যোগদান করে বিদেশী শাসকদের অধীনে কাজ করতে তাঁর মন চাইলো না। তাই তিনি ইচ্ছে করেই অশ্বারোহন পরীক্ষায় উপস্থিত থাকলেন না। অথচ ঘোড়ায় চড়ার জন্য সাহস, একাগ্রতা ও তৎপরতা সবেতেই তিনি পারদর্শী ছিলেন। এরপর তিনি বরোদার রাজার অধীনে কাজ নিয়ে ফিরে এলেন ভারতে। এখানে এসেই তাঁর নিজের দেশ সম্বন্ধে গভীর আগ্রহ জন্মে। প্রাচীন ভারতের কাব্য সাহিত্য ও দর্শনের জ্ঞান সাধনা শুরু করলেন। রামায়ণ মহাভারতের কিছু কিছু অংশ ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। এরকম সময়ে মারাঠা কেশরী বাল গঙ্গাধর তিলকের সাথে সখ্যতা স্থাপিত হয়। ফলে স্বাধীনতা সংগ্রামের এক প্রাণ প্রবাহ এনে দেয় শ্রীঅরবিন্দের জীবনে। এখানে থাকাকালীনই অন্যতম জাতীয় নেতা রুপে আত্মপ্রকাশ করেন। বাল গঙ্গাধর এর ঘনিষ্ঠ সহযোগী রুপে কাজ করেন। তার চিন্তা হল রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভারতবর্ষ একদিন লাভ করবে ঠিকই, কিন্তু ভারতবাসীরা যদি লোভ, হিংসা, দ্বেষ, ভেদাভেদ ত্যাগ করে, আর তার উন্নতির মধ্য দিয়ে জাতীয় চরিত্রের উন্নতির চেষ্টা না করে, তবে সে স্বাধীনতা সার্থক হয়ে উঠবে না সর্বতোভাবে। তিনি এই স্বাধীনতা সংগ্রামকে ধর্মযুদ্ধ বলেছেন। শ্রীঅরবিন্দ এবার অধ্যাত্ম চেতনার এক বেগবান স্রোতধারাকে প্রবাহিত করে সমৃদ্ধ করতে উৎসাহী হলেন।

শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষাতত্ত্ব বা জীবন দর্শন

সুশ্বেতা বোস
শিলিগুড়ি -১

২০২২ এর ১৫ই আগস্ট শ্রীঅরবিন্দের ১৫০তম জন্মদিন। সারা বছরের জন্যই শুরু হয়েছে শ্রীঅরবিন্দের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের পালা। এবছরই আবার ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ বছর। জীবনের শেষ দশকে এসে শ্রীঅরবিন্দ স্বপ্নের স্বাধীন ভারতকে পেয়েছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ একাধারে মহান বিপ্লবীদের গুরু, বিশাল মাপের সাহিত্যিক, সাংবাদিক, মহান কবি, দার্শনিক , মহান অধ্যাত্মসাধক ও বহুবিধ পত্রিকার সম্পাদক। শ্রীঅরবিন্দের জীবনদর্শনটাই যোগসাধনার। তাঁর মতে জীবনে কোনো কিছুকে ত্যাগ নয় সব কিছুর রুপান্তর প্রয়োজন। শ্রীঅরবিন্দের ‘যোগ সমন্বয় বা সিন্থেসিস অফ যোগা’ বইটি লিখবার উদ্দেশ্যই ছিল মানব সমাজকে উচ্চাঙ্গ শিক্ষা দেওয়ার, কীভাবে একটি জীবনকে ধীরে ধীরে পূর্ণাঙ্গ ভাগবতী জীবন করে গড়ে তোলা যায় যদি মনে থাকে প্রবল আস্পৃহা। যোগ সমন্বয় অর্থ হল জীবনের প্রতিটি কর্মধারাকে মহান জাগতিক শক্তির সঙ্গে যোগযুক্ত করা। শ্রীঅরবিন্দ জীবন দর্শনের মূল অস্ত্র হিসেবে ‘গীতা’কেই আঁকড়ে ‘গীতা নিবন্ধ’র মতো একটি অপূর্ব গ্রন্থ সমাজকে উপহার দিয়েছেন। তাঁর শিক্ষা দর্শন প্রাচীন ভারতীয় বেদান্ত এবং আধুনিক পাশ্চাত্যের জ্ঞান দুটো ধারাকেই মিলিয়ে। তাঁর দর্শনের মূল দুটি দিক মানুষের আত্মা ও ভোগ্যবস্তু। তিনি ভাবতেন অন্তরাত্মাকে আলোকিত করার মূল উৎস শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক এবং আধ্যাত্মিক ক্ষমতার বিকাশে। তাঁর শিক্ষা দর্শন মূলত পূর্ণযোগের। জীবনের সব কিছুটা নিয়েই এগিয়ে যেতে হয় ভাগবতী প্রেমের দিকে। এটাই শ্রীঅরবিন্দের যোগসাধনা তথা শিক্ষা দর্শনের মূল , তিনি প্রমানিত করে গিয়েছেন নিজের জীবন দিয়ে। তাঁর চরনে শত কোটি প্রণাম।

(লেখিকা সুশ্বেতা বোসের বাড়ি শিলিগুড়ি আশ্রমপাড়ায়)

শ্রীঅরবিন্দ

অনিল সাহা
(সম্পাদক, উত্তরের প্রয়াস, শিবমন্দির)

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, পৃথিবীতে যখনই ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের অভ্যুথথান ঘটিবে তখনই যুগে যুগে আর্ত মানবের রক্ষার জন্য আমি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইব। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের বানী স্মরণ করিয়া ভারতবাসী যুগাবতারে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন। ভারতবাসীর ধারণা শ্রীঅরবিন্দ এরুপ একজন অবতারকল্প পুরুষ ছিলেন । তিনি মহাপুরুষ শুধু নন, আধুনিক জগতের মুক্তিবানীর উদগাতা।

শ্রীঅরবিন্দ ১৮৭২ সালের ১৫ আগস্ট কলকাতায় জন্মগ্রহন করেন। তাঁর জন্মদিন স্বাধীন ভারতের জন্মদিন। তাঁর পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ সেকালের একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক ছিলেন। কৃষ্ণধন ঘোষ ইংল্যান্ডে গিয়ে চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি মাত্র সাত বৎসর বয়সে শ্রীঅরবিন্দকে ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে দেন। তিনি লন্ডনের সেন্ট পলস স্কুলে ভর্তি হন। শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন অসাধারন মেধাবী।

গ্রীক,ল্যাটিন , সংস্কৃত ও ইংরেজি সব ভাষাতেই তার সমান দক্ষতা ছিল। শ্রীঅরবিন্দের কর্মজীবন শুরু হয় বরোদায়। তিনি ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপনা করতে থাকেন। পরে ওই কলেজের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হন। বরোদায় অধ্যাপনাকালে এদেশের তরুন দলের সংস্পর্শে আসেন। দেশের দুর্দশা তাঁর মনে গভীর বেদনার সৃষ্টি করেছিল। তাই তিনি দেশ সেবায় জীবন উৎসর্গ করাই স্থির করেছিলেন। ১৯০৬ সালে অরবিন্দের রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। তিনি বন্দেমাতরম নামক ইংরেজি সংবাদপত্রের সম্পাদনার ভার গ্রহন করেন। তিনি কংগ্রেসের আবেদন নিবেদনের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালানোর পাশাপাশি সশস্ত্র বিপ্লবীদের পক্ষে প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখতে থাকেন। ১৯০৭ সালে বন্দেমাতরম পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের জন্য শ্রীঅরবিন্দ রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হন।

১৯০৮ সালে মানিকতলা বোমা মামলায় তাকে জড়িয়ে গ্রেপ্তার করা হয়। বিখ্যাত ব্যারিস্টার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ফী গ্রহন না করে তার পক্ষ সমর্থন করেন। এই মামলায় বহু তরুন বাঙালি সন্ত্রাসবাদীর ফাঁসি হয় আর প্রমানাভাবে অরবিন্দ মুক্তিলাভ করেন। মুক্তির পর রাজনৈতিক জীবন ছেড়ে মাদ্রাজের পন্ডিচেরীতে ফরাসি সরকারের সহযোগিতায় আশ্রম তৈরি করে যোগ সাধনায় মনোনিবেশ করেন। ৪৮ বছর ধরে সেখানে যোগ সাধনা করে মানবজাতির কল্যানে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর এই সাধনা নিজের জন্য নয়, জগতের কল্যানের জন্য। দি মাদার গ্রন্থটি খুবই মূল্যবান।

১৯০৫ সালের ৫ই ডিসেম্বর তাঁর দেহাবসান হয়। এই মহাপুরুষ, অধ্যাত্মসাধক, বিপ্লবী দেশপ্রেমিককে জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম।

ঋষি অরবিন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ

নির্মলেন্দু দাস
(শরৎ পল্লী, শিলিগুড়ি)

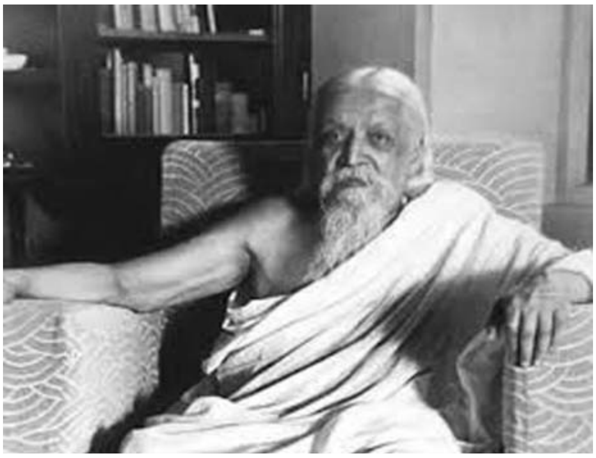

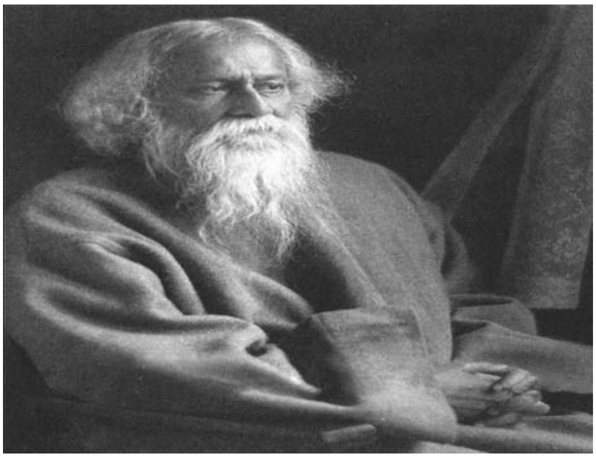

১৯২৮ সালের গ্রীষ্মে রবীন্দ্রনাথের দাক্ষিণাত্য সফরের সময়ের একটি ঘটনা চেন্নাই থেকে পন্ডিচেরি যাবার পথে। রবীন্দ্রনাথ যে জাহাজটিতে উঠেছিলেন পন্ডিচেরিতে গিয়ে অরবিন্দের সাথে দেখা করবার জন্য, সেই জাহাজ পন্ডিচেরির জেটিতে ভেড়ানো সম্ভব ছিল না। এখান থেকে নৌকায় করে স্থলভূমিতে নামতে হয়। সেজন্য রবীন্দ্রনাথ এবং সাথে ছিলেন যাত্রীসঙ্গী হিসাবে নির্মলকুমারী মহলানবিশ। এঁদের দুজনকে একটা পিপের মধ্যে বসিয়ে একটা ক্রেনের সাহায্যে নৌকায় নামিয়ে দেওয়া হয়। এই কথা প্রকাশিত হয়েছিল প্রবাসী নামক পত্রিকাতে শ্রাবণ, ১৩৩৫ সালে।রবীন্দ্রনাথ ওই পত্রিকায় লিখেছিলেন, ‘ ভাঙ্গা শরীর নিয়ে যথেষ্ট কষ্ট করেই নামতে হলো--- তা হোক অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে দেখা হয়েছে।--” অদ্ভূত এক যাত্রা। কোন আকর্ষনে রবীন্দ্রনাথ সেই সময় অসুস্থ শরীর নিয়ে অরবিন্দের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন? দেখা যাক ঘটনাটি কি।

শ্রীঅরবিন্দের বাস ভবনের এক নিভৃত কক্ষে দুজনের সেই ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার হয় ২৯শে মে। চিত্তরঞ্জন দেবের বর্ণনা অনুযায়ী “ উভয়ে উভয়কে দু'হাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন করলেন। তারপর দু'জন মুখোমুখি বসলেন দুটি চেয়ারে। রবীন্দ্রনাথ কথা বললেন, কিন্তু কি বললেন তা জানা যায় না। রবীন্দ্রনাথের কথার উত্তরে অরবিন্দ কি বললেন সে-ও অজ্ঞাত--”। এটা ছিল একান্ত সাক্ষাৎকার।

এ সম্পর্কে পরে রবীন্দ্রনাথ প্রবাসী পত্রিকায় অরবিন্দ ঘোষ শিরোনামে প্রকাশিত রচনাটিতে লিখেছিলেন,“ অনেকদিন মনে হল অরবিন্দ ঘোষকে দেখব। সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হল। ---প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝলুম ইনি আত্মাকেই সত্য করে চেয়েছেন, সত্য করে পেয়েওছেন--”ইত্যাদি। লেখাটির উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ লেখেন ঃ “ অরবিন্দকে তাঁর যৌবনের মুখে ক্ষুব্ধ আন্দোলনের মধ্যে যে তপস্যার আসনে দেখেছিলুম, সেখানে তাঁকে জানিয়েছি---অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার। আজ তাঁকে দেখলুম তাঁর দ্বিতীয় তপস্যার আসনে, অপ্রগলভ স্তব্ধতায়--আজও তাঁকে মনে মনে বলে এলুম--অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।”

শ্রীঅরবিন্দের সংগ্রামী ইতিহাস এবং আধ্যাত্মিক জগতের

ইতিহাসে দুটো দুই দিক। শ্রীঅরবিন্দের বাবা ছিলেন ডাঃকৃষ্ণধন ঘোষ। তিনি সেই যুগে চালচলনে বড় হয়েছিলেন। শিক্ষাও নিয়েছিলেন বিদেশে। তিনি চেয়েছিলেন তার ছেলেরা বাবার মতো সাহেবি শিক্ষায় ও আদব কায়দায় বড় হয়ে উঠুক। ছোট বেলায় অরবিন্দ এবং মনমোহন ও বিনয়ভূষন তিন ভাইকে দার্জিলিংএর 'লরেটো কনভেন্ট' স্কুলে ভর্তি করে দেন। পরে বিদেশে শিক্ষা দিয়েছিলেন। অরবিন্দ প্রায় ১৪ বছর ইংল্যান্ডে ছিলেন।প্রথম পাঁচ বছর ম্যানচেস্টারে, পরের ছয় বছর লন্ডনে, শেষ তিন বছর ছিলেন কেমব্রিজে। স্কুলের পড়া ছাড়াও অরবিন্দ ঘোষ ফরাসি কবিতা, উপন্যাস পাঠ করতেন, গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষায় কবিতা রচনা করেন।

এরপর শ্রীঅরবিন্দ বরোদার মহারাজা গাইকোয়াড়ের কাছে ২০০ টাকা মাসিক বেতনে কাজ শুরু করেন। চাকরিতে যোগদান করার পর তাকে জরিপের কাজে, পরে দেওয়ান-খানা বা মহাকরণে নিযুক্ত করা হয়। পরে বরোদা কলেজে ফরাসি ভাষার শিক্ষক হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। পরে এই কলেজেই ১৯০৪ সালে ভাইস প্রিন্সিপাল হন। এখানেই বাংলা এবং সংস্কৃত শিখেছেন । সে-যুগের বিশিষ্ট সাহিত্যিক দীনেন্দ্রকুমার রায় তাঁকে বাংলা শেখান। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রেমে পড়েছেন এই বরোদাতেই। বরোদায় অরবিন্দ ভারতীয় সংস্কৃতির উপর গভীর অধ্যয়ন শুরু করেন। এখানে থাকার সময় তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জানার জন্য রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, কালিদাস, সংস্কৃত ইত্যাদি পড়েন।

১৯০৬ সালে কলকাতায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের উদ্যোগে বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ বা জাতীয় বিদ্যালয় ও বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট (বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠিত হয়-- এই কলেজের প্রথম অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ। অনুজ বারীন ঘোষের মাধ্যমে বাংলা বিপ্লবী দলের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে। ১৯০৭ সালে তিনি 'বন্দেমাতরম' পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি প্রকাশ হওয়ার পর থেকে রাজদ্রোহের অভিযোগে সরকার পত্রিকাটি বন্ধ করার চেষ্টা করেন। সরকার এই পত্রিকার জনপ্রিয়তা দেখে ভয় পেলেন। ৩০শে জুলাই বন্দেমাতরম পত্রিকার উপর পুলিশের আক্রমন হয়। ১৪ আগস্ট অরবিন্দ ও বিপিন চন্দ্র পালকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এর পরে সেই রোমহর্ষক ঘটনা। ১৯০৮ সালের ৩০শে এপ্রিল ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে লক্ষ্য করে গাড়িতে বোমা ছোঁড়া হয়েছিল। সে ইতিহাস পাঠকের জানা। এই ঘটনার ফলে সারা দেশে হইচই পড়ে যায়। ২রা মে গ্রেপ্তার করা হয় অরবিন্দ ঘোষকে। ৫মে তাঁদের আদালতে পেশ করা হয়। অরবিন্দ ও অপর বন্দিদের আলিপুর জেলে স্থানান্তর করে আনা হয়। বছর খানেক চলে সেই মামলার শুনানি। ১৯০৯ সালে বিচারের রায় প্রকাশিত হয়। এই মামলায় অরবিন্দদের আইনি সাহায্য করেন বিখ্যাত ব্যারিস্টার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। অরবিন্দ কোর্টে বলেছিলেন, দেশপ্রেম কোনো অপরাধ নহে, দেশের স্বাধীনতা আমাদের ন্যায্য অধিকার, এটা চাওয়া অন্যায় নয়। অরবিন্দ ও বাকি নয়জনের বেকসুর খালাস হয়। বাকিদের বিভিন্ন মেয়াদে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও কারাবাসের আদেশ দেওয়া হয়।

কারাগারে থাকার সময় তাঁর অপরিমেয় আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ঘটে। আধ্যাত্মিক বিকাশ পূর্ণতার দিকে এগোতে থাকে। এরপর বিপ্লবী অরবিন্দ ঋষি অরবিন্দ রুপান্তরিত হন।

যুগের হাওয়া

গোপা দাস
(শরৎ পল্লী, শিলিগুড়ি)

(স্বাধীনতার ৭৫ বছরে কেমন দেখতে আমাদের দেশ? নেটের বাহাদুরিতে সবাই সব কিছু জেনে গেছে, অপরিপক্ক গাছে ফল ধরে পড়ে গেলে যেমন হয় তেমন আর কি! আমি আমার কবিতার মধ্যে এর কিছু আভাস তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি।)

স্বাধীনভাবে বাঁচবো আমি, রবো স্বাধীনভাবে
নিজের ইচ্ছায় চলবো আমি হচ্ছি বড় সবে।
ইংরাজী গানের মানে বুঝি না শুধু শুনে যাই
পপ গানের বাজনা শুনে কানে তাক লাগে তাই।
ডিসকো গানে মেতে ওঠে উঠতি মেয়েছেলে
রঙ্গিন জলে, রঙ্গিন আলোয় যায় রসাতলে।
মোবাইল ফোনে ব্যস্ত তারা সময়সীমা নাই
দিনে রাতে কথা বলে , কাজের বেলায় নাই।
ওদিকে, নুন আনতে পান্তা ফুরায় গড়িয়ে যায় বেলা
ছেলেমেয়ে অবুঝ সব, শুধুই করে অবহেলা।
এমন সমাজ উঠছে গড়ে দুঃখের সীমা নাই
পিতা-মাতার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা কিছুই নাই।
মাফিয়াদের মত তারা টাকা শুধুই চায়
বাবা-মায়ের দেবার মতো সাধ্য নাই হায়।
বৃদ্ধ পিতার মন ভাঙে, মা'য়ের আঁচল ভিজে
ভেবে তারা কুল পায় না, বাঁচবে কেমন ভাবে?

শহিদ স্মরনে

মুকুল দাস
(বয়স ৯৭, শরৎ পল্লী, শিলিগুড়ি)

ভয় নাই ভগবানে, নিঃশ্চিন্তে ঘুমাই!
নিশি কাটে, ভোর হয়, সূর্যের দেখা পাই।
ঘুম ভাঙ্গতেই হৈ হল্লা, বসি গিয়ে টেবিলে,
চা-এ চুমুক দিয়ে খবর পড়ি, ব্যস্ত থাকে সকলে।
কেহ করে ভোটের কারসাজি,কেহ করে টাকা গুনতি,
যত সেনা মরে মরুক, যার যাক, কিসের ক্ষতি!
আসছে ভোট, এখন হোক ভোটের কেরামতি।
দেশ সেবক হতে গেলে ভোটে আগে জিতি।
এইসব গল্প হয় খাবার টেবিলে নামতা পড়ার মত ।
এই দেশের নানা কথা জানে মানুষ শত শত।
হে শহিদ!
তোমাদের সমবেদনা জানাতে পারি না মুখে
ভারত মাতা তুমি কি কাতর হও না শহিদদের দুখে?
অন্যায় অবিচার করো, আনো শান্তির বাণী,
হে ধরিত্রী মাতা বাঁচাও তোমার ধরণী।
দেশপ্রেমিক কথার কথা, এতো স্বাধীনতার গল্প,
এখন ওসবের দরকার কি, সেনা মরে অল্প-স্বল্প।
আহ! কি সমাধান, দেশ জননীর চোখ ভরা জল,
আমরা সবাই আস্ফালন করি, বানাই বহু দল!

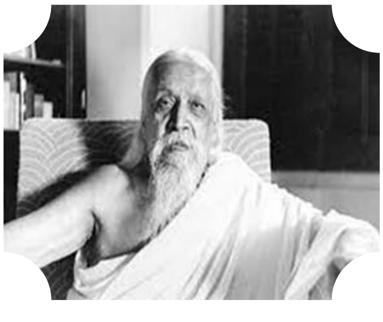

কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা --১৯

(আয়ুর এই পড়ন্ত বেলায় যখন জীবনের ফেলে আসা দিনগুলির দিকে ফিরে দেখি, তখন দেখতে পাই মানুষের এক বিশাল সমাবেশ। এই ধরনের মানুষের মধ্যেই এমন কয়েকজন রয়েছেন যাদের ব্যক্তিত্ব আমায় তাঁদের ঘনিষ্ট সম্পর্কের দিকে আকর্ষিত করেছে। সেই সব মানুষরা নিজের নিজের ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল এবং স্ব-ভাস্বর। নিজেকে খুব ধন্য মনে হয় যে কোনও যোগ্যতা না থেকেও এদের সংস্পর্শে আসতে পেরেছি। এদের নিবিড় সান্নিধ্য আমার অপূর্ণতাকে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হওয়ার অস্পৃহাকে কথা দিয়েই তাদের ছবি আঁকার চেষ্টা করছি। অনেকটা গঙ্গা জলে গঙ্গার পুজো। --মুসাফীর।

(গত পয়লা জুলাই চিকিৎসক দিবস সংখ্যার পর)

বহিরাগতকে মাতাজীর দর্শনের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য একজন সাধক সহকারি হিসেবে সঙ্গে নিয়ে যায়; মাতাজী পুরো ব্যবস্থাটি বাতিল করে দেন। ঋষি বিস্ময়ে হতবাক, এমনো হয়। তিনদিন পরে সবাই জমায়েত হয়--একটি শেষ সুযোগ দেওয়ার আকুল আকুতি মাতাজীকে জানানো হয়। মাতাজী শর্ত সাপেক্ষে অনুমতি দেন। বেশ কয়েকজনকে আশ্রম ত্যাগ করতে বলেন, দুজন পুরুষ ও মহিলাকে চয়েস দেওয়া হয় বিবাহ করে আশ্রমের কুমায়ুন ও হিমাচল প্রদেশে আশ্রমের যে কোন কেন্দ্রে গিয়ে সাধনা করার জন্য। তারা মাতাজীর আশীর্ব্বাদ নিয়ে চলে যায়। তাদের কেন্দ্রগুলির এখন খুব নামডাক। আশ্রম পরিচালন ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তন করা হয়। আশ্রমের প্রতিটি সদস্য তাদের কাজের জন্য যা সাধনার মূল অঙ্গ একাউন্টেবল। প্রতি বছর তাঁদের সেলফ এসেসমেন্ট জমা দিতে হয়। ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা সেগুলো দেখেন--তবে কেন গুরু গিরি এখানে নেই। কোন সদস্য সাহায্য চাইলে তবেই তার বিষয়ে কথা বলা যেতে পারে। সবাইকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া আছে তবে কোন রকম স্বেচ্ছচারিতাকে সহ্য করা হয় না।

মাতাজী বলেন এই ব্যবস্থা পরিবর্তনীয়। চেতনার পরিবর্তনের সাথেসাথে ব্যবস্থার ও নিয়মের পরিবর্তন করা হবে। এমনদিন আসবে যেদিন কোন নিয়মের বিধিনিষেধ এখন যা রয়েছে সেগুলোর আর প্রয়োজন হবে না। প্রায় দুবছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর মাতাজী আশ্রমের নামকরন করলেন। উত্তরন এর যাত্রা আরম্ভ হয়। একটি প্রাইভেট ট্রাস্ট গঠন হলো বারোজন সদস্য নিয়ে। যে কোন সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ একমতে হতে হবে। আরো তিন বছর পর আত্মবিকাশ নামে পাবলিক ট্রাস্ট গঠন হলো --ছয়জন সদস্য নিয়ে; সমস্ত বাণিজ্যিক কার্যকলাপ ট্রাস্টের অর্ন্তভুক্ত হলো। শেষ পরীক্ষা বা চরম পরীক্ষা অপেক্ষা করে রয়েছে। বর্তমানে মাতাজী কোন পরিচালন বিষয়ে ইনভলভ নন। সাধনার প্রয়োজনে সম্পূর্ণ অন্তরালের জীবনযাপন করছেন। গুটি কয়েক সদস্য ছাড়া কারুর ওনার কাছে যাওয়ার অনুমতি নেই। অন্তরাল হতে সব দেখছেন,যখন এই দেখাটিও থাকবে না --তখন হবে আশ্রমের চরম পরীক্ষা। মাতাজীর একটি কথা খুবই উল্লেখযোগ--কত ভক্ত শিষ্যরা অকাতরে তাঁদের পরিশ্রম করা উপার্জন থেকে অর্ঘ্য পাঠাচ্ছে, কোন প্রশ্ন নেই, নেই কোন অপেক্ষা, শুধু দিয়ে যাচ্ছে। তোমাদের সর্বদা সচেতন থাকতে হবে মানুষ অপেক্ষারত --কবে তাঁরা পাবে তাঁদের চেতনার সামগ্রিক উর্দ্ধায়ন ও পরিবর্তনের পথে চলার চাবিকাঠিটি।এটি জেনো ভগবানের কাছে -- কোন ত্রুটি সামান্যতম অবহেলাও চলবে না। সমস্ত গবেষণার মধ্যে মানব চেতনার গবেষনা খুব কঠিন--খুব বিপদসঙ্কুল একটু এদিক-সেদিক হলে একেবারে প্রলয় ঘটে যাবে। ব্যস, আমার মনে হয় তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। একটা কথা -- এমন অনেক প্রশ্ন মানুষের জীবনে আসে যার উত্তর খুঁজে নিতে হয়, প্রশ্ন করে সেই সব প্রশ্নের উত্তর মেলে না। চলো ফেরা যাক।

(ক্রমশ)

সার্ধশতবর্ষে শ্রীঅরবিন্দ----দিলীপ কুমার রায় ও সাহানা দেবী ১২৫ বছর

ডালিয়া সরকার
(পন্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম নিবাসিনী)

আমরা সগৌরবে উদযাপন করছি শ্রীঅরবিন্দের ১৫০ বছরের জন্মজয়ন্তী--১৫ই আগস্ট ২০২২ সাল। সেই সঙ্গে তাঁর দুই অনুগামী দিলীপকুমার রায় (২২শে জানুয়ারী ১৮৯৭) ও সাহানা দেবী (১৭ই মে ১৮৯৭) ছুঁয়ে গেলেন তাঁদের জন্মের ১২৫ বছর। এই তিন ব্যক্তিত্ব যেন ত্রিপত্র বিশিষ্ট একটি বিল্বপত্র। শীর্ষপত্রটি শ্রীঅরবিন্দ এবং উক্ত দুজন দুপাশের দুটি পত্র। দিলীপ কুমার ও সাহানাদেবী--এই দুই প্রতিভাধর পন্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের আশ্রয়ে আসার পর তাঁরা এক অনন্য মাত্রায় সার্থক হয়ে ওঠেন। আশ্রমে আসার আগে তাঁরা দুজনেই সঙ্গীত জগতের বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। দুজনেই পারিবারিক ও সামাজিক পটভূমিতে ছিলেন সমৃদ্ধ। দিলীপকুমার কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের একমাত্র পুত্র আর সাহানা দেবী ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ভাগ্নী---সর্বোপরি রবীন্দ্রস্নেহধন্যা। আশ্রমপূর্ব জীবনে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তাঁরা যথেষ্ট সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুনাম অর্জন করেছিলেন। তবুও কিসের এক অমোঘ টানে যেন সামাজিক জীবনে তাঁরা পরিতৃপ্ত হতে পারেননি। দিলীপকুমার সুদর্শন, উচ্চশিক্ষিত গুণান্বিত কিন্তু অল্প বয়সে পিতামাতাকে হারিয়েছেন এবং বহু দোলাচল চিত্ততায় ভুগেছেন। অন্যদিকে সাহানাদেবীর বিবাহিত পারিবারিক জীবন সুখের হয়নি। অকালে তাঁর কঠিন ব্যাধি ও নানা বাধাবিপত্তির সঙ্গে তিনি নিজের ভিতরের শক্তি নিয়ে লড়াই করে জয়ী হয়েছেন।

শ্রীঅরবিন্দ যখন কলকাতায় রাজনৈতিক নেতা হিসাবে পূর্ণদমে বৈপ্লবিক ক্রিয়াকর্মে ব্যাপৃত তখন দিলীপকুমার ও সাহানা দেবী নেহাতই বালক-বালিকা। কেউ কাউকে জানতেন না। তবে শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে সেই বয়সেই সাহানা দেবী জানতেন এবং তাঁকে দেখেছেনও। আলিপুর বোমার জটিল মামলা থেকে অভূতপূর্ব কৌশলে সাহানা দেবীর মামাবাবু ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ শ্রীঅরবিন্দকে মুক্ত করে নিজের বাসভবনে নিয়ে আসেন। সেখানে বাড়ির মহিলারা তাঁকে অভিনন্দিত করেন। এসব ঘটনা সাহানা দেবী দেখেছেন। জোরাল রবীন্দ্র সান্নিধ্যে থেকেও শ্রীঅরবিন্দকেই তাঁর শেষ ও পরম আশ্রয় বলে মনে করেছিলেন। দিলীপকুমারের মধ্যেও ছিল একটা বড় অন্বেষন , যেটা তাঁকে কোনভাবেই স্থির হতে দেয়নি। জাগতিক সব আকর্ষন কাটিয়ে তিনিও উপনীত হয়েছিলেন শ্রীঅরবিন্দের দ্বারে। এই দুই জনের আভিজাত্য ও মর্যাদার পূর্ণ সমাদর করেই শ্রীঅরবিন্দ-শ্রীমা তাঁদের আশ্রমে রেখেছিলেন। নতুন জীবনে তাঁরা সঙ্গীতে, নৃত্যে, কাব্যে, সাহিত্যে আশায় আনন্দে ভরে ওঠেন। কিন্তু-- কিন্তু সবই আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গ হিসাবে। শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা প্রবর্তন করেছেন ‘‘ All Life is Yoga ” -- পুরো জীবনই যোগ। তাই কোন জিনিসই জীবন থেকে বাদ যাবে না। কিন্তু তুলে ধরতে হবে আধ্যাত্মিক আদর্শের মধ্যে। শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমার তত্বাবধানে আশ্রমে

যাঁরা জীবন নিবেদন করতে এসেছিলেন তাঁরা এই উদ্দেশ্যেই চালিত হয়েছেন। এই পথের বাধাবিপত্তি অজস্র। সেসব কথা চিঠিতে খোলাখুলিভাবে লিখে তাঁরা শ্রীঅরবিন্দ-শ্রীমার কাছে সাহায্য ও আশীর্বাদ চাইতেন যাতে এসব বাধাবিপত্তি জয় করা যায়। পরম স্নেহ-ভালবাসায় ও সহানুভূতিতে গুরু স্থানীয় এই দুই মহৎ-প্রাণ প্রত্যেকের চিঠির উত্তর দিতেন, নির্দেশ দিতেন ও ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ রাখতেন। এই দৃষ্টিকোনে দিলীপকুমার ও সাহানা দেবী আধ্যাত্মিক পথের বাধাবিপত্তি এভাবেই উত্তীর্ণ হয়েছেন। দিলীপকুমার একটু তার্কিক যুক্তিপর মনের মানুষ। শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে চার হাজার চিঠিপত্র লিখেছেন। সাহানা দেবীও শতশত চিঠি পেয়েছেন। শ্রীঅরবিন্দের '' Letters on Yoga '' গ্রন্থাবলীতে সেসব অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। তবে দিলীপকুমারের বিষয়বৈচিত্র্য ছিল বিস্তৃত। রাত জেগে জেগে শ্রীঅরবিন্দ সকলের চিঠির উত্তর লিখতেন। সাহানা দেবী তাঁর চিঠিগুলি বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেন ''শ্রীঅরবিন্দের পত্র সম্পদ'' নামে। এসব চিঠিপত্রে এমন কোন সমস্যা নেই যার উত্তর পাওয়া যাবে না। অবশ্যই সাধনার স্তরে।

কবি নিশিকান্ত দিলীপকুমারকে বলতেন শ্রীঅরবিন্দের আদুরে ছেলে। সত্যিই শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সব আব্দার মেনে নিতেন।একবার তিনি শ্রীঅরবিন্দকে বললেন যে তাঁকে হাসতে হবে। 'দর্শন' দেওয়ার সময় তিনি গুরুগম্ভীরভাবে অর্ন্তভেদী দৃষ্টি নিয়ে সবাইকে দেখেন। দিলীপকুমার আব্দার করলেন দর্শনের সময় তিনি যখন লাইনে শ্রীঅরবিন্দের সামনে দাঁড়াবেন তখন যেন শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে দেখে হাসেন। শ্রীঅরবিন্দ এই আব্দার মেনে নিলেন। এরপর যথারীতি দর্শনের দিনে 'দর্শন' হয়ে গেল। কিন্তু সেরকম কিছুই ঘটল না। দিলীপকুমার শ্রীঅরবিন্দের কাছে অভিমান ব্যক্ত করলেন। শ্রীঅরবিন্দ জানালেন যে তিনিই ঠিকই হেসেছিলেন, দিলীপকুমার বুঝতে পারেননি।

সাধনার কঠিনতা সত্বেও সাহানা দেবী আজীবন একটানা আশ্রমে বসবাস করেন। পরে তাঁর দিদিরাও এসে যোগদান করেন। নলিনা, অমিয়া, অরুনা ও সাহানা-- বিকেল হলেই চার বোনে আশ্রমবাড়িতে একসঙ্গে বসতেন। দেখে খুব ভাল লাগত।

দিলীপকুমার 'ভ্রাম্যমান' প্রকৃতির ছিলেন বসে সঙ্গীতের টানে, অনুষ্ঠান ও কনসার্ট করতে নানা জায়গায় যেতেন। এর থেকে যে অর্থ-সমাগম হত তার অনেকটাই গঠনমুখী আশ্রমকে তিনি সমর্পন করেছেন। কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি আশ্রমে কাটাতে পারেননি। পুনেতে নিজের আশ্রম তৈরি করে সেখানেই সাধনা করেছেন। এতে অবশ্য শ্রীঅরবিন্দের প্রতি তাঁর ভক্তি ও ভালবাসা একটুও কমেনি।

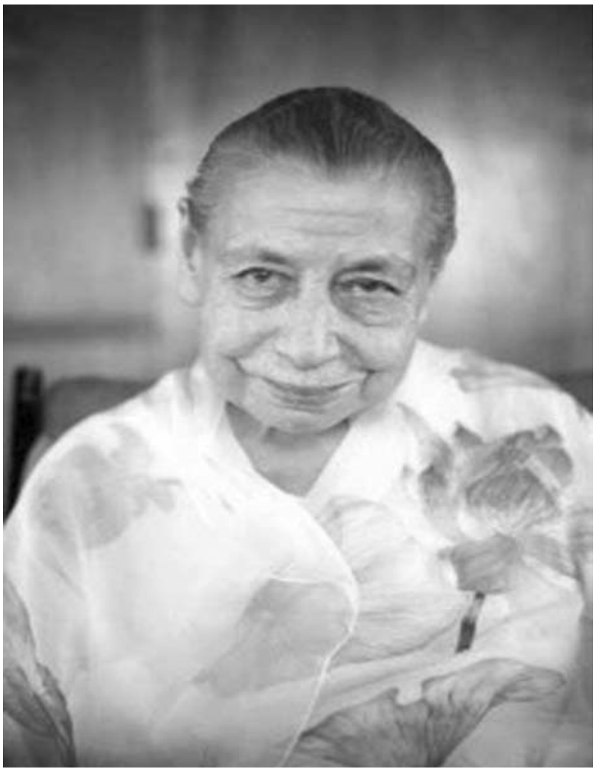

শ্রীঅরবিন্দ ভাষাবিদও ছিলেন

ডঃ গৌরমোহন রায়
(অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, সুকান্ত নগর, শিলিগুড়ি)

শ্রীঅরবিন্দের প্রতি আমি গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল। কারণ তিনি এত বড় মাপের মানুষ , এত বড় চিন্তাবিদ , পন্ডিত এবং স্বদেশপ্রেমিক যে তাঁর যথার্থ মূল্যায়ন করা কঠিন। কঠিন এই জন্য যে তাঁর মূল্যায়ন করতে গেলে অনেক উচুঁ মাপের পান্ডিত্যের প্রয়োজন। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতটুকু তাঁকে বুঝতে পারি, সেই বোঝাকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। এক হলো, তাঁর বাল্যকাল যেটা ইউরোপে কেটেছে। দুই হলো, যখন তিনি পশ্চিম ভারতে বরোদায় এলেন। তৃতীয় পর্যায় হলো, পন্ডিচেরীর অধ্যাত্মজীবন। এই তিনটি পর্যায় ভাগ করলে তাঁর জীবনাবলীর একটা সংক্ষিপ্ত ধারণা করা যেতে পারে।

তাঁর ছেলেবেলা ছবছর বয়স থেকে ইংল্যান্ডে কেটেছে। তাঁর বাবা ছিলেন ডাক্তার। তিনি দুই ছেলেকে ইংল্যান্ডের এক গ্রামার স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন।তার ফল একদিক থেকে ভালো হয়েছিল। কারণ , অরবিন্দকে আমরা বহু ভাষবিদ হিসাবে জানি। অনেক ভাষা তিনি শিখেছিলেন। সবচেয়ে ভালো করে শিখেছিলেন ইংরেজি এবং ল্যাটিন। যখন তিনি গ্রামারের স্কুলে পড়েন, তিনি ওই সময় ল্যাটিন মাধ্যমে পড়াশোনা করেছিলেন যা সত্যিই বিস্ময়ের। মহামানব শ্রীঅরবিন্দ খুব বড় রকমের ভাষার পন্ডিত ছিলেন। সেই ভাষা হলো ল্যাটিন ও ইংরেজি। বরোদায় তিনি যখন এলেন বরোদার মহারাজা এককথায় তাঁর স্টেট কলেজের ইংরেজির প্রধান অধ্যাপক করে দিলেন। আর সুনামের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ দীর্ঘ পনের বছর সেখানে অধ্যাপনা করেন। পাঠক হিসাবেও তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সমকক্ষ ছিলেন। তাঁর পান্ডিত্যের আলো ভারতবাসী দেখতে পেয়েছিল।

আমাদের দেশে যত বড় বড় স্বদেশপ্রান ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছে ---রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস, ক্ষুদিরাম, মাতঙ্গিনী হাজার, মাস্টারদা ---এদের সঙ্গে সবচেয়ে উঁচু আসনে বসাতে হবে শ্রীঅরবিন্দকে। এক্ষেত্রে তাঁর ভাই বারীন ঘোষের নামটি শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারন করতে হবে। বারীন ঘোষের বিরুদ্ধে মামলা মোকদ্দমা করেছে ইংরেজ। ভারতের বিপ্লব চেতনার ইতিহাসে শ্রীঅরবিন্দের নামটি উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

তাঁর জীবনের তৃতীয় পর্যায়ে চলে আসে পন্ডিচেরীর অধ্যাত্মসাধনা। শ্রীমা এলেন। তাঁর সঙ্গে মিলিত অধ্যাত্মসাধনা। দুজনে মিলে ভারতকে নতুন একটা আধ্যাত্মিক স্তরে তাঁরা উন্নীত করলেন। পন্ডিচেরী এক তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হলো। যারা ধর্মপ্রান মানুষ , যারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী,যারা তাঁর প্রদত্ত শান্তি ও শক্তিতে বিশ্বাসী তাঁরা অসংখ্য মানুষ পন্ডিচেরীতে চলে গেলেন। সেখানে একটা ছোটখাটো শহর গড়ে উঠলো।

আজকের দিনে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর নাম উচ্চারন করি। অনেক মনিষীর আবির্ভাব হয়েছে ভারতে। ভারত সেজন্য গর্ব অনুভব করতে পারে। বিশ্বের দরবারে ভারতের যে প্রতিষ্ঠা সেই প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজি, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের পাশাপাশি শ্রীঅরবিন্দের নামও এসে যায়। আমি তাঁর লাইফ ডিভাইন পড়তে চেষ্টা করেছি। খুব উঁচু মানের বই লাইফ ডিভাইন। খুব জ্ঞানী পন্ডিত এবং অধ্যাত্ম সাধনায় ব্রতী না হলে এ বই হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। এ বইয়ের সবটুকু বুঝতে আমি পারিনি। আজ বিদেশ থেকেও শত শত মানুষ আসেন পন্ডিচেরীতে।

এবারে স্বাধীনতার ৭৫ বছরও চলছে। স্বাধীনতা আমরা দু পথে পেয়েছি। একটা হিংসার পথ, আরেকটি অহিংসার পথ। জওহরলাল নেহরু, গান্ধীজি তাঁরা চেষ্টা করলে দেশভাগ এড়ানো যেতো। দেশভাগের ফল ভালো হয়নি। দেশ ভাগ রোধ করা যেতে পারতো। গান্ধীজি ছিলেন বিরাট শান্তিকামী আন্দোলনের নেতা। আজকের দিনে আমার মতো নব্বই বছরের বৃদ্ধের মধ্যে আজ বাজে, কেন আমরা ছিন্নমূল হয়ে গেলাম? কেন বঙ্গভঙ্গ হলো? কেন পঞ্জাব ভাগ হলো? কেন পাকিস্তানের উদ্ভব হলো। রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষ কোথায় গেলো? শক হুন দল পাঠান মোগল , এক দেহে হল লীন। কেন ভেঙে গেলো সেই ঐক্য?

স্বাধীনতা দিবসের ভাবনায়

সামসুল আলম

স্বাধীনতার ৭৫ বছর আমরা পার করতে চলেছি। এখানে প্রশ্ন হলো, প্রকৃত স্বাধীনতা কি ভারতবাসী পেয়েছে? যদি কোথাও ঘাটতি থাকে সেই ঘাটটি যাতে শীঘ্রই পূরন হয়ে যায় সেটাই প্রত্যাশা করবো। আজ যেসব শিশু জন্মগ্রহন করছে তারা যাতে প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহন করতে পারে সেটা আমাদের লক্ষ্য করার বিষয় রয়েছে। অন্ধকার যুগে যুগে ছিল, থাকবেই কিন্তু আমরা সব শিক্ষকশিক্ষিকারা মিলে সেই অন্ধকারটিকে আলোর পথে নিয়ে যেতে পারি। দেশে অনেক সরকারি স্কুল রয়েছে। আমরা যারা শিক্ষক রয়েছি সবাই যদি ঠিকঠাকভাবে আমাদের কাজটি করি তবে কিন্তু আমরা ছাত্রছাত্রীদের একটি জায়গায় নিয়ে যেতে পারবো। মানবসম্পদ কিন্তু তৈরি হতে পারে আমাদের হাত ধরেই। আমরা যদি আমাদের দায়িত্বের প্রতি দায়িত্ববান হই তবে অন্ধকার আলোতে পরিনত হতে পারে।

সরকারি স্কুলে সঠিকভাবে পরিষেবা যদি আমরা দিতে পারি, তবে সাধারণ মানুষের আস্থা ফিরবে সরকারি স্কুলের প্রতি। অনেক গরিব সাধারণ মানুষ আজ বেসরকারি স্কুলের দিকে ভিড়ছে। এভাবে চলতে থাকলে শিক্ষাটা তাদের কাছে একটি স্বপ্নের বিষয়বস্তু হয়ে উঠবে। আমরা যারা শিক্ষকতা পেশায় যুক্ত আছি, আমরা যদি এ বিষয়ে সচেতন হই তবে সরকারি স্কুলের ছেলেমেয়েদের আমরা সম্পদে পরিণত করতে পারবো। সরকারি স্কুলের প্রতি জনগণের আস্থা ফিরে আসুক আমরা চাই। আমাদের অনেক টাকা বেতন দেওয়া হয়। চাকরির নিরাপত্তা রয়েছে আমাদের। নতুন যারা শিক্ষকতায় আসবেন তাদের চাকরি বাঁচাতে হলে এখন থেকেই সরকারি স্কুলে সেভাবে শিক্ষা দিতে হবে।

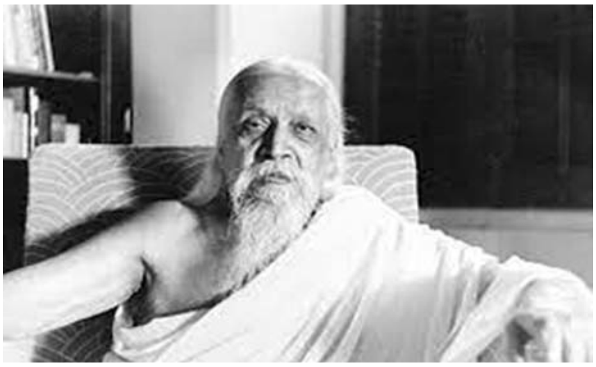

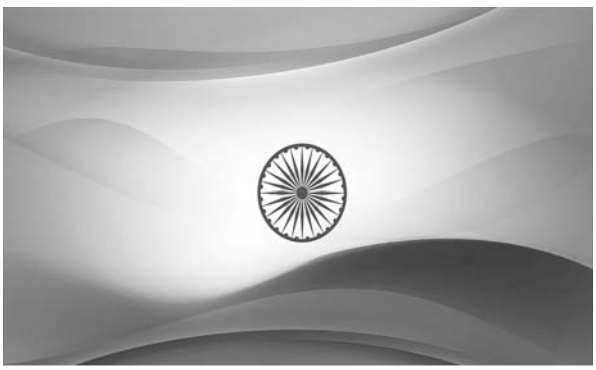

আমার পরিবার বলতে এখন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাই। সবাই স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের তাদের পরিবারের অঙ্গ মনে করলে স্কুলের পরিবেশ বদলে যেতে পারে।

আমাদের বিধাননগর মুরলীগঞ্জ হাইস্কুলে শুরু হয়েছে জল খাওয়ানোর কর্মসূচি। প্রতিদিন আমরা ঘন্টা বাজিয়ে চলেছি। ঘন্টা বাজতেই ছাত্রছাত্রীরা জল খায়। স্কুলের মধ্যে দফায় দফায় ওরা পাঁচবার করে জল খায়। এতে ওদের ক্লান্তি আসছে না। ওদের স্বাস্থ্য ভালো থাকছে। রোটারি গ্রীনের সহায়তায় এই কর্মসূচি চলছে। জল খাওয়াটা একটা উৎসবের মতো হয়ে গিয়েছে। আমাদের স্কুলে অঙ্ক, ইংরেজি ৪৫ মিনিটেরও বেশি সময় ধরে ক্লাস হয়। আরও কিছু বিষয় চালু হয়েছে এই স্কুলে। আমাদের মতো আরও কিছু স্কুলে ভালো কাজ হচ্ছে। এখন সবাই মিলে যদি স্কুলে ভালো কাজ হয়, তবে পরিবেশ বদলে যাবেই।

শিক্ষক দিবসে আমাদের স্কুলে উপহার দেওয়ার রীতি নেই। স্কুলে শিক্ষক সেজে অনেক ছাত্রছাত্রী অভিনয় করে। শিক্ষক দিবসে শিক্ষকদের উপহার দেওয়ার প্রচলিত ধারণা আমরা মেনে চলি না। বরঞ্চ আমরাই ছাত্রছাত্রীদের কিছু খাওয়াই সেদিন। আর পনের আগস্ট বলে নয়,প্রতিদিন স্কুলে জাতীয় পতাকা উত্তোলন হয়।

(সামসুল আলম মুরলীগঞ্জ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং একজন ব্যতিক্রমী বিরল ব্যক্তিত্ব)

একবার বুড়ির ছদ্মবেশে নাড়াজোল রাজ পরিবারের কাছে অর্থ সাহায্য চাইতে এসেছিলেন শ্রীঅরবিন্দ

বাপি ঘোষ ঃ স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি ঘিরে গোটা দেশ জুড়েই বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহন করা হচ্ছে। একইসঙ্গে জন্মসার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে শ্রীঅরবিন্দকেও স্মরণ করা হচ্ছে। আর এ প্রসঙ্গেই চলে আসছে মেদিনীপুরের নাড়াজোল রাজ পরিবারের কথা। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ওবিপ্লব আন্দোলনে নাড়াজোল রাজ পরিবারের ভূমিকা অসামান্য। নাড়াজোল রাজবাড়ি মেদিনীপুর জেলায়। তবে সেই রাজবাড়িতে কেউ থাকেন না। স্কুল কলেজের জন্য দানধ্যান করে দেওয়া হয়েছে। এই রাজ পরিবারেরই বহু নিদর্শনের মধ্যে একটি নির্দশন হলো কলকাতা পি জি হাসপাতালের পিছনে দেবেন্দ্রলাল খান রোড। ওই রাস্তারই সাত নম্বর বাড়ি হলো ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যমন্ডিত নাড়াজোল হাউস। সেই নাড়াজোল রাজপরিবারের রানি প্রয়াত অঞ্জলি খানের পুতি দেবরাজ ঘোষের কাছ থেকে জানা গিয়েছে অনেক কথা।বিশ্বরুপ মুখোপাধ্যায় লিখিত অস্তমিত

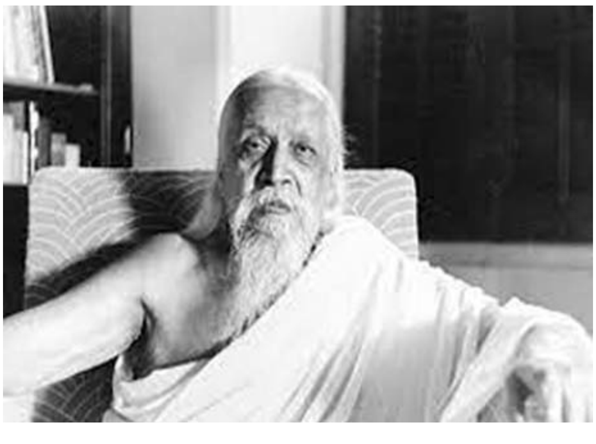

রাজমহিমা বইতে উল্লেখ করা আছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বিপ্লব আন্দোলনে রাজ পরিবারের অসামান্য ভূমিকার কথা।

ঐতিহাসিক নাড়াজোল রাজ পরিবারের রানি অঞ্জলি খানের পুতি দেবরাজ এবং অস্তমিত রাজমহিমা বই থেকে জানা যাচ্ছে, ''রাজা নরেন্দ্রলাল খান সরাসরি স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় বাঙালি সমাজ চমকে গিয়েছিল। অরবিন্দ ঘোষ, হেম কানুনগো তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। মেদিনীপুরে বোমার মামলায় নরেন্দ্রলাল গ্রেপ্তার হন। কারাবরনও করেন। শহিদ ক্ষুদিরামের বাবা ছিলেন নাড়াজোলের তহশীলদার। ক্ষুদিরামের পরিবারকে বহুভাবে সাহায্য করেছেন নরেন্দ্রলাল।--- দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁকে প্রথম প্রাদেশিক কাউন্সিলে নির্বাচিত করে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর ছেলে দেবেন্দ্রলাল খান ছিলেন বাবার মতোই। তিনি রাজা উপাধিও নেননি।দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও নেতাজির পরিবারের সঙ্গে তাঁর নিবিড় ঘনিষ্ঠতা ছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনদাশকে তিনি ব্ল্যাঙ্ক চেক লিখে দিতেন, যখনই তাঁদের কোন টাকার দরকার হত। সুভাষচন্দ্র যখন চিকিৎসার জন্য ভিয়েনায় গেলেন তখনও তিনি প্রচুর সাহায্য করেছিলেন।''

অস্তমিত রাজমহিমা জানাচ্ছে,''শ্রীঅরবিন্দের মামার বাড়ি ছিল মেদিনীপুরে। সেই সূত্রেই রাজা নরেন্দ্রলাল খানের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। কলকাতায় বৌবাজারে রাজা নরেন্দ্রলাল খানের বাড়ি ছিলো। তিনি যখন কলকাতার বাড়িতে থাকতেন তখন শ্রীঅরবিন্দ তাঁর কাছে আসতেন অর্থ সাহায্যের জন্য। শ্রীঅরবিন্দ একবার বুড়ির ছদ্মবেশে এসেছিলেন,তখন রাজা নরেন্দ্রলাল খান তাঁর নাতি অমরেন্দ্রলাল খানের হাত দিয়ে কাপড়ের পুঁটলি বেঁধে তারমধ্যে টাকা দিয়ে পাঠিয়েছিলেন শ্রীঅরবিন্দের জন্য।'

এই নাড়াজোল রাজ পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা উদয় নারায়ন ঘোষ।

পঞ্চম পুরুষ কার্তিক রাম 'রায় ' উপাধি পান। ওই সময় থেকেই রায় হিসাবে পদবি ব্যবহৃত হতে থাকে। অষ্টম পুরুষ শ্রীবলবন্তকে 'খান'উপাধি দিয়েছিলেন তৎকালীন বাংলার নবাব নাজিম।সেই থেকেই এই বংশে খান উপাধি চলে আসছে। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁয়ের আমলে চুণীলাল রায় রাজা উপাধি পেয়েছিলেন।

রাজা চুণীলাল খানের পুত্র ছিলেন রাজা অযোধ্যালাল খান। তারই প্রপৌত্র রাজা নরেন্দ্রলাল খান। নরেন্দ্রলালের দুই পুত্র ছিলো, দেবেন্দ্রলাল ও বিজয়কৃষ্ণ। দেবেন্দ্রলালের পুত্র ছিলেন অমরেন্দ্রলাল খান।আর অমরেন্দ্রলাল খানেরই স্ত্রী হলেন অঞ্জলি খান অর্থাৎ দেবরাজ ঘোষের বড়মা। প্রয়াত রানি অঞ্জলি খানের পুতি হলেন দেবরাজ। অঞ্জলি খানের কন্যা হলেন রাজ্যশ্রী দেবী, আর রাজ্যশ্রীদেবীর পুত্র হলেন রাজদীপ ঘোষ এবং রাজদীপবাবুর স্ত্রী হলেন কাবেরি ঘোষ। রাজদীপবাবুর দুই পুত্র দেবরাজ ও রনদীপ। এখন নাড়াজোল রাজ পরিবারের সেই সব সম্পত্তি দেখাশোনা করেন দেবরাজের বাবা রাজদীপবাবু। শিলিগুড়িতে শিক্ষকতার সূত্রে এখন বসবাস করেন প্রতিভাবান দেবরাজ। স্বাধীনতার ৭৫ বছর এবং শ্রীঅরবিন্দের ১৫০ বছর পূর্তিতে কিছু কর্মসূচি গ্রহন করেছেন দেবরাজ। ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনার ফাঁকে দেশের মনিষীদের কথাও স্মরন করুক, এমনটাই চান দেবরাজ। শ্রীঅরবিন্দের যোগ শক্তি ও বিজ্ঞানের সঙ্গে মেলবন্ধনের যুক্তির কথাও বলেন দেবরাজ।

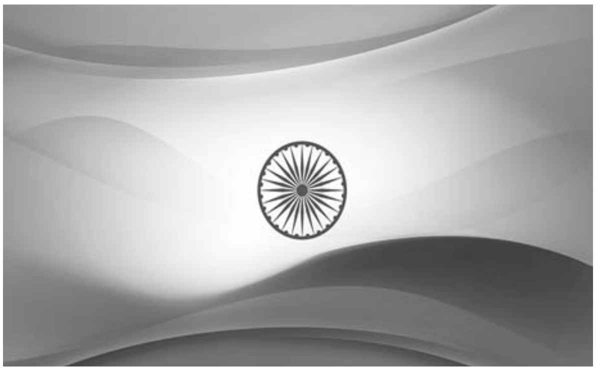

স্বাধীনতা দিবস এবং শ্রীঅরবিন্দ স্মরনে

চিত্তরঞ্জন সরকার

(প্রধান শিক্ষক, দক্ষিন শান্তিনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়, রাজগঞ্জ পশ্চিম মন্ডল, শিলিগুড়ি--জল)

১৫ আগস্ট দেশের স্বাধীনতা দিবস। এই দিনে আমরা স্কুল কলেজ, অফিস, ক্লাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে থাকি। শ্রদ্ধার সঙ্গে দেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে থাকি। এই বিশেষ দিনে আমাদের শ্রীঅরবিন্দের কথা না বললেই নয়। কেননা, ১৫ আগস্টই শ্রীঅরবিন্দের জন্ম, ১৮৭২ সালে। কলকাতার কোন্নগরে তাঁর জন্ম। ছোটবেলাতে তিনি পড়াশোনায় বেশ ভালো ছিলেন। তাঁর পিতা পুরো পরিবার নিয়ে চলে যান লন্ডনে। তাঁকে আই সি এস পড়াবেন বলে। লন্ডনের পড়াশোনা শেষ করে তিনি চলে আসেন বরোদায়। বরোদার রাজার সঙ্গে তাঁর ইংল্যান্ডেই সাক্ষাৎ হয়েছিল। বরোদার রাজা দেখেন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র শ্রীঅরবিন্দ। রাজা ভাবেন এইরকম মেধাবী ছাত্রকে ভারতে কাজে লাগানো প্রয়োজন। শুধু ভাবনা নয়, বরোদার রাজা তাঁর ভাবনাকে বাস্তবে প্রয়োগ করেন। তিনি তাঁর রাজ্যে কাজের ব্যবস্থা করে দেন শ্রীঅরবিন্দের জন্য। তারপর বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়েও তাঁকে অধ্যাপক হিসাবে নিয়োগ করেন। সেখানে কিছুদিন পড়ান শ্রীঅরবিন্দ। তারপর চলে আসেন বাংলায়। ১৯০৬ সালে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেন। যোগদান করে বিভিন্ন বিপ্লবীদের উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁর ভাই বারীন ঘোষকেও তিনি কাজে লাগান। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে এভাবে অনেকটা এগিয়ে দেন তিনি। পরে রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে সরে গিয়ে ১৯১০ সালে তিনি চলে যান পন্ডিচেরিতে। সেখানে গিয়ে দর্শন, ধর্ম , অধ্যাত্মবাদ নিয়ে তিনি পড়াশোনা করেন। ৩৮টি বইও লিখেছেন। তারমধ্যে দ্য লাইফ ডিভাইন বিশেষ উল্লেখযোগ। একদিকে তিনি যেমন বিপ্লব আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন অন্যদিকে আধ্যাত্মিক জীবনে প্রবেশ করেও আমাদের দিয়ে গেছেন এক নতুন রাস্তা। ফ্রান্স থেকে এসেছিলেন মিরা রিচার্ড। তাঁর নাম হয় শ্রীমা।

শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা যৌথভাবে আমাদের আধ্যাত্মিকতার এক নতুন আলো দিয়ে গিয়েছেন। স্বাধীনতা দিবসে আমরা যেমন বিভিন্ন দেশপ্রেমিক মনিষীকে স্মরন করবো তেমনই স্মরন করবো শ্রীঅরবিন্দকে। আমরা আমাদের স্কুলে স্বাধীনতা দিবস পালনের সময় স্বাধীনতার কথা আলোচনার পাশাপাশি শ্রীঅরবিন্দকে নিয়েও আলোচনা করবো। জন্মসার্ধশতবর্ষে শ্রীঅরবিন্দের প্রতি রইলো আমার গভীর শ্রদ্ধা, প্রণাম।

সৌন্দর্য চর্চার কাজ শিখে অনেক বেকার ছেলেমেয়ে স্বনির্ভর হচ্ছেন

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ বিগত দুবছর করোনার ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্য উৎসবের দিনগুলোয় ব্যবসাবাণিজ্য মার খেয়েছে। বিয়ে অনুষ্ঠান থেকে সামাজিক উৎসব সবেতেই টান পড়েছিল। এবার অন্তত সেইরকম ভয়াবহ পরিস্থিতি নেই। আর তাই বিভিন্ন স্থানে শুরু হয়েছে পুজো প্রস্তুতি। বিভিন্ন পুজো আয়োজক যেমন খুঁটি পুজোর মাধ্যমে পুজো প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন তেমনই ব্যবসায়ীদের মধ্যেও একটা প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। শিলিগুড়ি মাটিগাড়ার সিটি সেন্টারেও শুরু হয়েছে তেমন প্রস্তুতি। দার্জিলিং বেড়াতে আসা অনেক পর্যটককেই সিটি সেন্টারে পা রাখতে দেখা যায়। সিটি সেন্টারে এমনই একটি সেন্টার হল মধুরিমা ফ্যাসিনেশন এন্ড একাডেমি। ট্যাটু থেকে শুরু করে নখের পরিচর্যা, নেইল আর্ট থেকে হেয়ার ট্রিটমেন্ট সহ সৌন্দর্য চর্চার কাজ হয় সেখানে। অনেক বেকার ছেলেমেয়ে সেখানে সৌন্দর্য চর্চার বিভিন্ন বিষয় শিখে স্বনির্ভর হচ্ছেন। ইদানীং কেউ যদি ট্যাটুর মাধ্যমে সামাজিক ও পরিবেশ সচেতনতার কোনও বার্তা দিতে চান সেটা তাঁরা দিতে পারেন বলে সেখানকার সৌন্দর্যশিল্পী মধুমিতা ঘোষ জানালেন। পুজোর সাজে সাজতে অনেকেই সেখানে ভিড় করেন আর তাদের জন্য কিছু ছাড়ের বন্দোবস্তও তাঁরা রেখেছেন বলে মধুমিতাদেবী জানালেন।

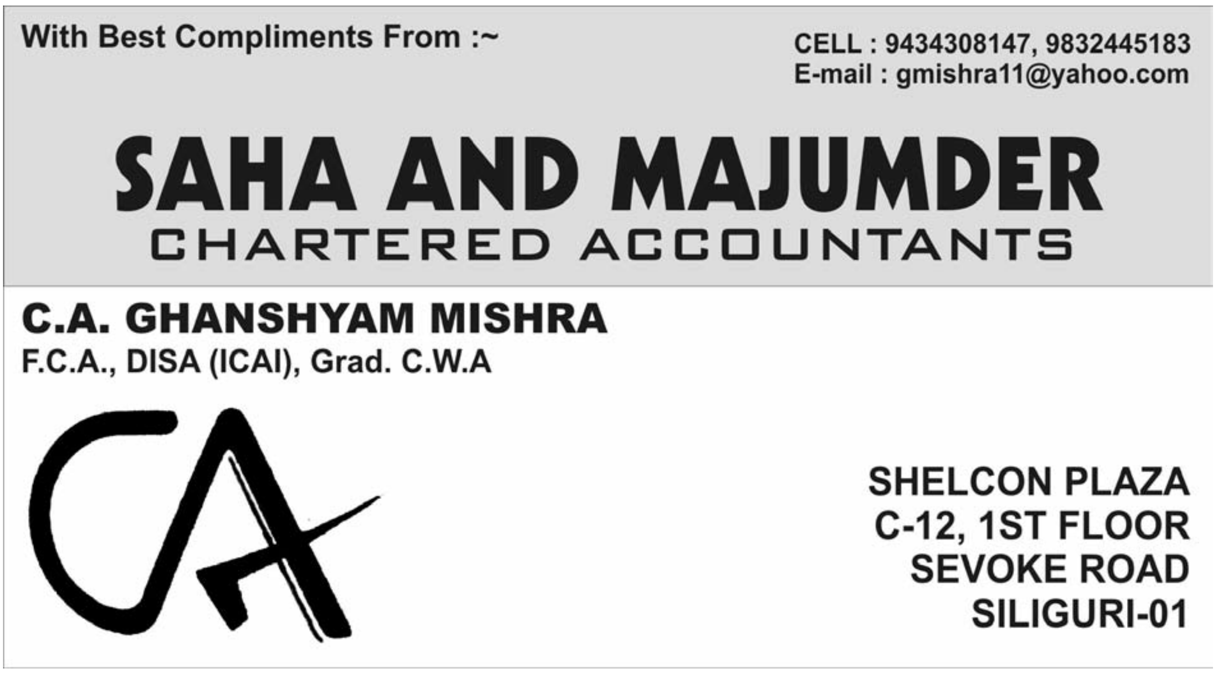

স্বাধীনতা দিবস এবং শ্রীঅরবিন্দ স্মরনে

চিত্তরঞ্জন সরকার

(প্রধান শিক্ষক, দক্ষিন শান্তিনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়, রাজগঞ্জ পশ্চিম মন্ডল, শিলিগুড়ি--জল)

১৫ আগস্ট দেশের স্বাধীনতা দিবস। এই দিনে আমরা স্কুল কলেজ, অফিস, ক্লাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে থাকি। শ্রদ্ধার সঙ্গে দেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে থাকি। এই বিশেষ দিনে আমাদের শ্রীঅরবিন্দের কথা না বললেই নয়। কেননা, ১৫ আগস্টই শ্রীঅরবিন্দের জন্ম, ১৮৭২ সালে। কলকাতার কোন্নগরে তাঁর জন্ম। ছোটবেলাতে তিনি পড়াশোনায় বেশ ভালো ছিলেন। তাঁর পিতা পুরো পরিবার নিয়ে চলে যান লন্ডনে। তাঁকে আই সি এস পড়াবেন বলে। লন্ডনের পড়াশোনা শেষ করে তিনি চলে আসেন বরোদায়। বরোদার রাজার সঙ্গে তাঁর ইংল্যান্ডেই সাক্ষাৎ হয়েছিল। বরোদার রাজা দেখেন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র শ্রীঅরবিন্দ। রাজা ভাবেন এইরকম মেধাবী ছাত্রকে ভারতে কাজে লাগানো প্রয়োজন। শুধু ভাবনা নয়, বরোদার রাজা তাঁর ভাবনাকে বাস্তবে প্রয়োগ করেন। তিনি তাঁর রাজ্যে কাজের ব্যবস্থা করে দেন শ্রীঅরবিন্দের জন্য। তারপর বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়েও তাঁকে অধ্যাপক হিসাবে নিয়োগ করেন। সেখানে কিছুদিন পড়ান শ্রীঅরবিন্দ। তারপর চলে আসেন বাংলায়। ১৯০৬ সালে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেন। যোগদান করে বিভিন্ন বিপ্লবীদের উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁর ভাই বারীন ঘোষকেও তিনি কাজে লাগান। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে এভাবে অনেকটা এগিয়ে দেন তিনি। পরে রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে সরে গিয়ে ১৯১০ সালে তিনি চলে যান পন্ডিচেরিতে। সেখানে গিয়ে দর্শন, ধর্ম , অধ্যাত্মবাদ নিয়ে তিনি পড়াশোনা করেন। ৩৮টি বইও লিখেছেন। তারমধ্যে দ্য লাইফ ডিভাইন বিশেষ উল্লেখযোগ। একদিকে তিনি যেমন বিপ্লব আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন অন্যদিকে আধ্যাত্মিক জীবনে প্রবেশ করেও আমাদের দিয়ে গেছেন এক নতুন রাস্তা। ফ্রান্স থেকে এসেছিলেন মিরা রিচার্ড। তাঁর নাম হয় শ্রীমা।

শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা যৌথভাবে আমাদের আধ্যাত্মিকতার এক নতুন আলো দিয়ে গিয়েছেন। স্বাধীনতা দিবসে আমরা যেমন বিভিন্ন দেশপ্রেমিক মনিষীকে স্মরন করবো তেমনই স্মরন করবো শ্রীঅরবিন্দকে। আমরা আমাদের স্কুলে স্বাধীনতা দিবস পালনের সময় স্বাধীনতার কথা আলোচনার পাশাপাশি শ্রীঅরবিন্দকে নিয়েও আলোচনা করবো। জন্মসার্ধশতবর্ষে শ্রীঅরবিন্দের প্রতি রইলো আমার গভীর শ্রদ্ধা, প্রণাম।

সকলকে স্বাধীনতা দিবস এবং শিক্ষক দিবসের আগাম শুভেচ্ছা ঃ

দেবপ্রিয় বড়ুয়া

প্রতিষ্ঠাতা ও অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক

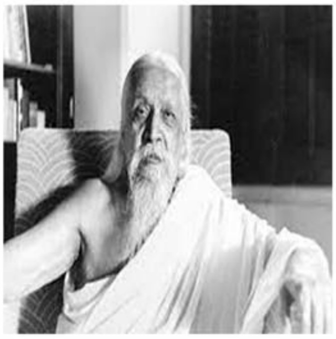

শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া বুদ্ধভারতী হাইস্কুল

SRI AUROBINDO GHOSH & HIS PHILOSOPHY AND SPRITUAL VISION

Faculty of Terai B. Ed . College

Sri Aurobindo Ghosh was a poet and Indian Nationalist. He was also a journalist, editing newspapers such as "VANDE-MATARAM”. He joined the Indian Movement for Independence from British colonial rule , until 1910 was one of its influential leaders and then became a spiritual reformer, introducing his visions on human progress and spiritual evolution.

EARLY LIFE OF SRI AUROBINDO GHOSH

Sri Aurobindo Ghosh was born in Kolkata, Bengal Presidency , Indian on 15th August 1872 in a Bengali family that was associated with village of Konnagar in Hooghly district of present day west Bengal.

The word “Aurobindo” means 'Lotus' in Sanskrit. His father Krishan Dhan Ghosh loved the western culture and he wanted his son grow up into a fake English man. So Aurobindo was sent to England at the age of seven and he lived there for 14 years. He got education in London and Cambridge and he became a master in English, Greek and Latin

In 1893 he came back to India, joined the state service in Baroda, working first in the Survey and Settlements and departments. In 1897 during his work in Baroda, he started working as a parttime French teacher at Baroda college. During his stay at Baroda, he had contributed to many articles to Indu Prakash.He started talking an active interest in the politics of the Indian Independence movement against British colonial rule.

Aurobindo attended the 1906 Congress meeting headed by Dadabhai Naoroji and participated as a councillor in forming the fourfold objectives of "SWARAJ, SWADESH, BOYCOTT And NATIONAL EDUCATION”.

In 1907-1908 Aurobindo travelled extensively to Pune , Bombay and Baroda to firm support for nationalist cause ,giving speeches and meetings with groups. The British Government arrested Aurobindo and put him in Alipore Jail for a year in connection with the Alipore Bomb Case.

FROM JAIL TO DIVINITY--

In the year 1908, Aurobindo Ghosh was arrested by the police but got released the following year. Even after being in jail, he did not stop writing and continued to make people aware of their independence. During this period in the jail, his view of life was radically changed due to spiritual experiences and realizations. consequently, his aim went for beyond the service and liberation of the country. After coming out of jail, he began his new publications: Dharma and Karma yogini in 1909.It is essential to note that when he was in jail, he realised something that helped him in turning towards Yoga and internal awakening. Since then he started focusing more on spiritual awakening through philosophical and mystical ways.

After the life turning realization Aurobindo Ghosh moved to Pondicherry, a former French colony, to begin his new life. There, he started a new path of spirituality and learned human evolution through internal yoga.

SPIRITUAL LIFE

After his spiritual realization experiences, Sri Aurobindo became more focused on developing this idea and promoting it among people. He claimed to hear voices of Vivekananda asking him to begin on the

path of spiritualism. In Pondicherry, he dedicated his time and energy to spiritual and philosophical quests. He started Arya, a monthly magazine including his philosophy in 1914.

Slowly, people started realizing the ideas of Aurobindo and started becoming his followers. The numbers kept increasing that led ton formation of Sri Aurobindo Ashram in 1926.

SRI AUROBINDO ASHRAM -

A large number of people started following him when he moved to Pondicherry where he started spreading spiritualism through his monthly magazine Arya.

The Ashram was established in 1926 and Aurobindo started using Sri before his names, which means sacred in Sanskrit. Mirra Richard, a French affiliate of Sri Aurobindo in spiritualism, helped in laying down the foundation of Sri Aurobindo Ashram .When Aurobindo Ghosh went into seclusion; Mirra Richard took charge of the Ashram in 1926.

The contribution of Sri Aurobindo in the field of literature and spiritualism is remarkable .One can learn a lot from his inspirational and motivational life that helped people in moving to the path of internal awakening.

Aurobindo's General Philosophy of life

Sri Aurobindo's philosophy of life is based on an experienced integralism. It is a synthesis of idealism, realism, naturalism and pragmatism. His life began with psychic experiences connected with his political, philosophical and poetic life The general philosophical ideas of Aurobindo are found mostly in his weekly newspaper“ karma yogi”.

Unity of truth

He observes, “first of all, there is undoubtedly a truth, one and eternal, which we are seeking, from which all other truth finds its rightful place in the total scheme of knowledge"

SUPERMIND

This is the keyword of Aurobindo's philosophy. He believes that the mind of man is imperfect and is not in a position to understand the integral truth. Only the super mind can have an understanding of the internal truth .Aurobindo remarks, "man will became a super mind. super mind will have a super mental consciousness. Consciousness of sat chit - Anand : Truth, Self, Bliss, Beauty, Goodness."

SUPERMAN

Man becomes a superman when he attains a super mind. He surrenders himself completely to the will of God and becomes a superman. Aurobindo aimed at integral man. The superman is the integral man, the ideal man who makes an ideal society.

PURNA YOGA

Aurobindo thought that there is a wide gulf between the ordinary mind and the super mind. He tried to integrate them into a single whole through purna yoga. He believed that purna yoga helps man to realise the supreme, the purushothama. According to him, “All the life is ‘yoga'".In the words of Aurobindo ,"The very first lesson in this yoga is to face life and its trials with a quite mind, a firm courage and an entire reliance on the 'Divine Shakti'

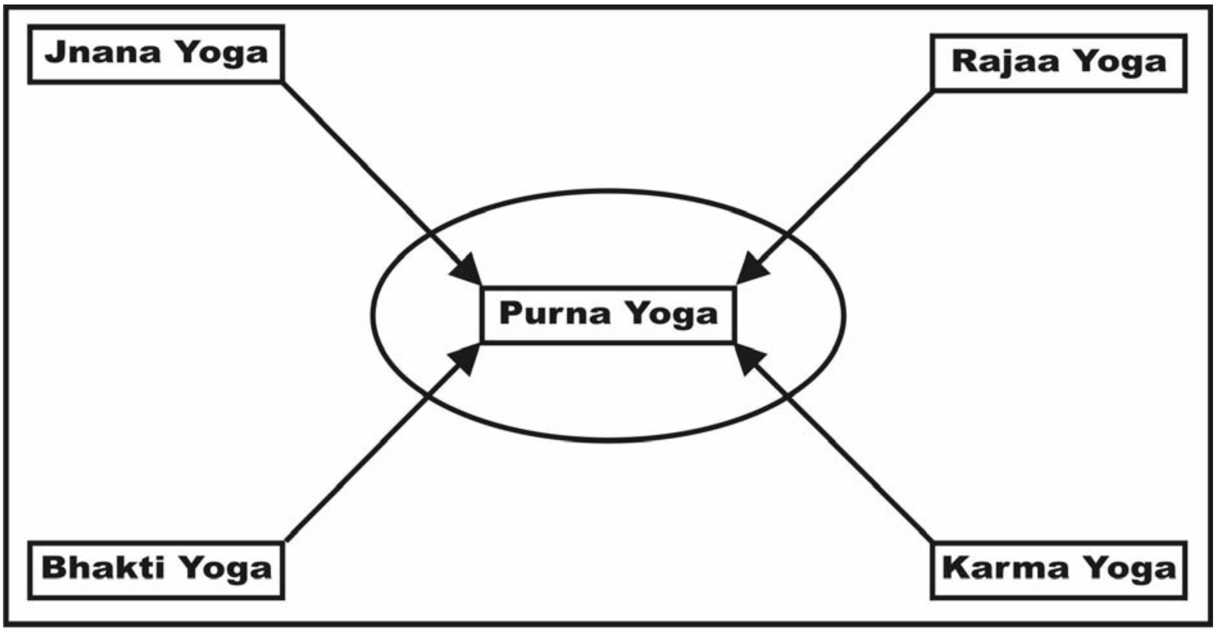

TYPES OF YOGA

Life

Aurobindo was of the opinion that life is universal and it is imperishable. According to him, "Life is a form of cosmic energy, a dynamic movement or current of it, positive or negative, a constant act or play of the force which builds up forms, energises them by an unceasing process of disintegration and renewal of their substances".

Rebirth:

Aurobindo had a deep faith in the philosophy of rebirth. According to him, birth and death are a predetermined process in the scheme of evolution. In the words of Aurobindo, "All the secrets of circumstances of rebirth centre around the capital need of the soul, the need of growth, the need of experience, that governs the line of its evolution and all the rest is accessory".

Law of karma:

Aurobindo believed that man is the maker of his own fate. But the heredity and environment are determined by the present and past actions of man. He found continuity between different births. In this way he believed the doctrine of karma. However, karma does not determine the fate of soul.

Evolution of man:

Aurobindo was of the opinion that the individual is in the continuous process of evolution to attain the union of the individual soul with the supreme soul. According to him, "Life is not for life alone, but for God. There is an inner law and meaning for all things depending on the supreme". This is the inner law, which guides, regulates and controls the universe, and propels it into action.

Experienced integration:

Aurobindo's philosophy is the result of his concept of "experienced integration". It is an integral approach to solve various problems of human life. It is a synthesis of the idealism, realism, naturalism and pragmatism of the East and the West and of the old and the new.

Spiritualism:

Aurobindo was a spiritualist. He regretted the neglect of spiritual elements, which is responsible for the decay of human societies. He says, "The radical defect of all civilization has been the neglect of the spiritual elements".

CONCLUSION –

Aurobindo is a great philosopher, educationist, nationalist and a yogi. His contribution to the field of education is very unique. He stresses child-centred education and allows maximum freedom to the child for his natural development. He integrates the Western philosophy with the Indian one. He accepts the teacher as a helper, guide and instructor. The bases of his philosophy of education are spiritual faith, brahmacharya and yoga practices. His philosophical ideas lead us from materialism to spiritualism. He preaches the ideals and values of Indian culture based on brahmacharya, yoga, concentration and meditation. His preaching helps an individual to attain the full development of his body, mind and soul in a harmonious way. The philosophy of Sri Aurobindo Ghosh is a unique one in the field of Indian education. He wants to make the Indian society good and happy by making the individuals good through education. In the words of Dr. R.S.Mani, "His views on education reveal that Sri Aurobindo Ghosh was one of the most eminent and distinguished educationists of our country".

ঋষি অরবিন্দ

চিত্তরঞ্জন সরকার

(প্রধান শিক্ষক, নিবাস--ঘোঘোমালি, শিলিগুড়ি-৬,
দূরভাষ-৭৯০৮২৯৮৪৩৪)

১৫ই আগস্ট ১৮৭২ সন,
জন্মিলেন বঙ্গসন্তান
কৃষ্ণধনের প্রান ;
কেউবা বলেন অরবিন্দ ,
কেউবা আবার শ্রীঅরবিন্দ
দুজনারই একই কায়া ,
স্বর্ণলতার স্নেহধন্য
আই সি এস হবেন বলে, চলে গেলেন বিলেতে ,
শিক্ষা শেষে পটে গেলেন বরোদাজের কথাতে ;
চাকরি পেলেন অফিসে , উন্নীত প্রফেসারিতে ,
ত্যাজিয়া সকল সুখ , এলেন বঙ্গে ১৯০৬-এতে
কাঁপালেন গোটা ভারত স্বাধীনতার নামে ,
বঙ্গভঙ্গ রদে গেলেন বারীনের সনে ;
ইংরেজদের উঠলো নাভিশ্বাস , অনুজের হল জেল-বাস ,
বুদ্ধি দিলেন সি আর দাশ, অগ্রজের নির্দোষ হল ফাঁস ।
সুবোধ বালক , উজ্জ্বল শিক্ষার্থী , তেজস্বী বিপ্লবী ,
পরক্ষিয়া সকল , চলিলেন ঈশ্বর অভিমুখী ;
দিয়ে আধ্যাত্মিক শ্রম , স্থাপিলেন অরবিন্দ আশ্রম ,
জইয়ে বিশ্ব-প্রীতি , খ্যাতিলেন পন্ডিচেরি।
চরম শিখরে ছিলেন তিনি
তাইতো তাহারে মানি ;
বিনম্র চিত্তে নমস্কার করি,
ঋষি অরবিন্দ , পূর্ণ স্বাধীনতাকামী।

উত্তরবঙ্গের বৌদ্ধ ধর্ম, সংস্কৃতি ও ইতিহাস নিয়ে বই

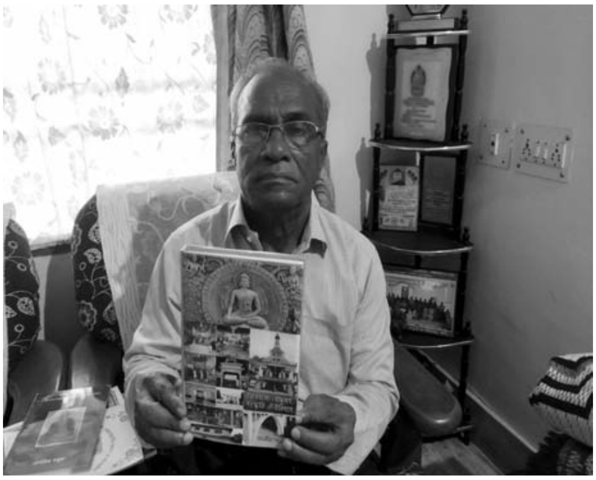

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ'' দার্জিলিং জেলার ইতিহাস নানা ঘটনামন্ডিত। দার্জিলিং নামটিতেও বৈচিত্র রয়েছে। 'দোর্জে' অর্থাৎ বজ্র থেকেই দোরজেলিং বা বজ্রপাতের দেশ থেকেই দার্জিলিং নামের উৎপত্তি। দ্বিমতে, দুর্জয়লিঙ্গ (অবজারভেটরি হিল) বা তিব্বতি ভাষায় বড় পাহাড়ই হলো দার্জিলিং। কেউবা বলেন ,লেপচা ভাষায় ভগবানের বাসস্থান অর্থাৎ পৃথিবীর স্বর্গ দার্জ্যুলাঙ্গ থেকেই দার্জিলিং নামকরণ। আবার প্রথম মনাস্ট্রির স্রষ্টা দোরজেরিংই লামা থেকেই নাকি দার্জিলিং নামকরন করা হয়।'' এভাবেই সে বইতে দার্জিলিং সম্পর্কে কিছু বর্ণনা মেলে ধরেছেন লেখক তথা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক দেবপ্রিয় বড়ুয়া। উত্তরবঙ্গের বৌদ্ধ ধর্ম , সংস্কৃতি ও ইতিহাস নামক ওই বইটি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে শিলিগুড়ি থেকে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা সম্প্রতি শিলিগুড়ি হায়দরপাড়ায় এসেছিলেন লেখক দেবপ্রিয়বাবুর প্রয়াত স্ত্রী শীলা বড়ুয়ার প্রথম মৃত্যু বার্ষিকীতে। সেখানেই প্রকাশিত হয় বইটি।

আশি বছর পেরিয়েছে দেবপ্রিয়বাবুর। কিন্তু এই বয়সেও তিনি দিনরাত লেখালেখি নিয়ে পড়ে থাকছেন আর একের পর এক বই প্রকাশ করে চলেছেন। তবে উত্তরবঙ্গের বৌদ্ধ ধর্ম, সংস্কৃতি ও ইতিহাস বইটি বিভিন্ন মহলে সাড়া ফেলেছে। তাঁর মতে, আগামীতে গবেষকদের বেশ কাজে লাগবে বইটি। বিশ্বে থেরবাদী বৌদ্ধ সংঘের ইতিহাস, উত্তরবঙ্গের ১৯টি বৌদ্ধ বিহার, তিনটি সাধনা কেন্দ্র, তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, থেরবাদী ও মহাযানপন্থী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, বড়ুয়া বৌদ্ধদের ধর্মীয়, সামাজিক জীবন ও বিবাহ পদ্ধতি , জন্মদিন ও নামকরন, পোষাক পরিচ্ছদ সহ বিভিন্ন দিক মেলে ধরা হয়েছে। সেই বইতেই লেখা রয়েছে,' উনিশ শতকে সিকিম রাজের অধীন ছিল দার্জিলিং। ১৭৮০তে নেপাল থেকে গোর্খারা এসে দখল নেয় দার্জিলিংয়ের। ১৮১৭তে অ্যাংলো নেপাল যুদ্ধে হেরে দার্জিলিং ছাড়ে নেপাল। আর ১৮২৮ সালে আগমন ঘটে লয়েড ও গ্রান্ট নামে দুই ব্রিটিশের। সেদিনে সাংগ্রিলা দেখেশুনে দুই ব্রিটিশ অফিসার প্রেমে পড়ে দার্জিলিংয়ের। বাসনা জাগে স্যানাটেরিয়াম ও হিল স্টেশন রুপে দার্জিলিং পেতে। শুধু হিল স্টেশন কেন নেপাল ও তিব্বতের চাবিকাঠি রুপে দার্জিলিংয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করে সাহেবরা। অবশেষে ১৮৩৫ সালে সুচতুর ব্রিটিশ গোর্খা হটাতে সিকিম রাজের সাহায্যে গিয়ে বার্ষিক তিন হাজার টাকার পারিতোষিক রুপে দখল নেয় দার্জিলিংয়ের। অর্থাৎ দার্জিলিং আসে ব্রিটিশ ভারতে সিকিম থেকে। বর্তমান ২০২২ সালে দার্জিলিংয়ের বয়স ১৮৭ বছর।

শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গে শিক্ষা বিস্তারে দেবপ্রিয়বাবুর অবদান উল্লেখ করার মতো।বহু দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে তিনি পড়াশোনার জন্য বইপত্র সহ বিভিন্নরকম সহায়তা করেছেন ধারাবাহিকভাবে। এরইমাঝে বৌদ্ধ ধর্ম নিয়ে তিনি গবেষণাধর্মী এবং মননশীল বই একের পর এক প্রকাশ করে চলেছেন। আশি বছর পার হলেও লেখালেখি এবং বই প্রকাশনা তাঁর অব্যাহত রয়েছে।

৭৫ বছরে আমি-- ভারত মায়ের অনুভূতি

সজল কুমার গুহ
(শিবমন্দির, শিলিগুড়ি)

অত্যাচার, অনাচারে আজ আমি ক্লান্ত,
অহংকার, হিংসা, ভ্রষ্টাচারে তোরা আজ
উৎশৃঙ্খল, অশান্ত।।
সন্তান বলে ভাবতে তোদের আজ পাই ভীষন লজ্জা,
বীরত্যাগী সন্তানেরা মোর নিয়েছে মৃত্যু শয্যা।।
বৃটিশ শৃঙ্খল থেকে করতে আমায় মুক্ত,
ওরা মিলে সবাই করছিল হাত-শক্ত।।
দুঃখ যাতনা সহেছিল অশেষ আনতে স্বাধীনতা,
বৃটিশ সিংহের তাই ওরা মানেনি কোন বদান্যতা।।
সুখ ওরা চায়নি মোটেই শুধু--নিজের জন্য,
(ভারত) মায়ের মুক্তি ও সবার সুখশান্তি ছিল ওদের কাম্য।।
ওদের কথা ভাবিস কি কখনো কেউ তোরা?
ওরা যে ছিল সব সন্তান মোরা সেরা।।
গর্ভধারিণী মোকেও তোরা করিস অনাদর অত্যাচার,
মাতৃঋণ শোধের বদলে মাকে করিস ঘর থেকে বার।।
আদালত যখন ফিরিয়ে দেয় মায়ের অধিকার,
বুকটা যায় ভরে, মন চায় বিচারককে দিতে পুরস্কার।।
নারী আজ হয়েছে অনেকের কাছে ভোগ্য পণ্য,
ওদের করে পাচার, করে নির্যাতন কেউ ভাবে ধন্য।।
বলিহারি নারী! লজ্জা, ঘৃণা, ভয়-- এ ছিল তোমার সজ্জা,
সব খুইয়ে এখন মাটিতে লুটায় তোমার ধ্বজা
স্বাধীনতার মর্ম তোরা গিয়েছিস সব ভুলি
আরো স্বাধীনতা তরে অস্ত্র নিয়েছিস হাতে তুলি।।
আমাকে আর করবি কত তোরা ভাগাভাগি?
ভাগ না পেলেই করিস মারামারি,রাগারাগি।
সর্বাঙ্গ আমার জ্বালিয়ে পুড়িয়ে করছিস প্রায় ছারখার,
দূষণ-উষ্ণায়ণ আদিতে আক্রান্ত আমি বারবার।
ধিক! তোদের সন্তান বলে দিতে আর পরিচয়
ভ্রষ্টাচার, ভ্রূণহত্যা, খুনোখুনিতে হচ্ছিস ক্ষয়।
৭৫ বছরে তোদের ব্যবহারে আমি বড়ই দুঃখী
এত বৈভবের পারলি না আমায় করতে সুখী?
তবে, ভালো সন্তান-সন্ততি এখনো কিছু আছে আমি জানি,
আনন্দে বুকটা যায় ভরে,ওদের কৃতিত্ব যখন শুনি।
সবশেষে বলি, তোদের একটি দামী কথা ঃ
'বৃত্তি-প্রবৃত্তি' স্বীয় অধীন করাই সত্যিকারের স্বাধীনতা।।

উৎস

সুলেখা সরকার
(বিধান মার্কেট, শিলিগুড়ি)

তোমার নামে আমার একটি আলো আছে।
আমি শতাব্দীর ভিক্ষুক
দু-হাতে মুঠো মুঠো নিস্তব্ধতা ভরে খাই।
শরীরের ফাটল চিরে বেরিয়ে আসে যে শ্লোক
তাকে আসনে বসিয়ে
সেই আলো পেড়ে দিই রোজ।
দূরত্বের চারপাশ ঘুরে আসি প্রতিরাতে।
বেশি কিছু নয়,
তোমার নামে আমার একজন ঈশ্বর আছেন।

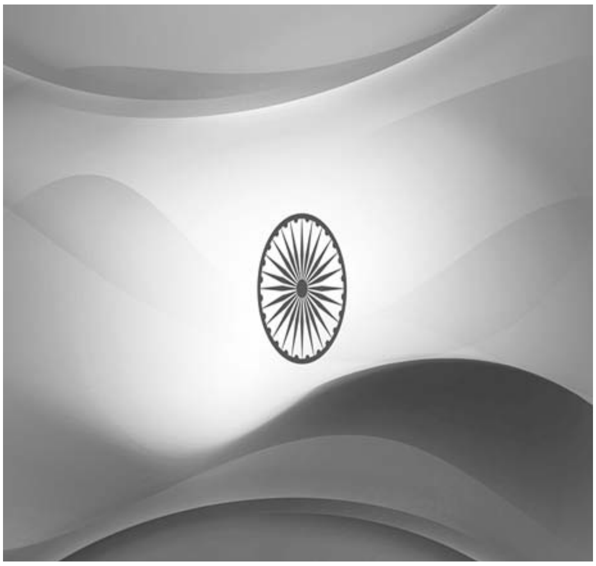

শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলে চক্ষু পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর ৭২জন ছাত্রীর চোখের সমস্যা ধরা পড়লো। এই ৭২ জনের মধ্যে গত বৃহস্পতিবার ২৮ জুলাই ৬৭ জনের চোখ পরীক্ষা করেন চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাঃ স্নেহা বাত্রা। তারমধ্যে ৬৪ জনের চোখের সমস্যা গুরুতর। শিলিগুড়ি বর্ধমান রোডের দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউটে সেই সব ছাত্রীর চোখের আরও বিশদে পরীক্ষা হবে বিনামূল্যে। প্রসঙ্গত শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যাপিকা তথা সমাজসেবী বিদ্যাবতী আগরওয়ালা বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবীকে নিয়ে বিগত কিছুদিন ধরে ওই স্কুলের ৬০০ জন ছাত্রীর চোখ স্ক্রিনিং করেন। এরমধ্যে ৭২ জনের চোখের সমস্যা ধরা পড়ে। দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট থেকে বৃহস্পতিবার ডাঃ স্নেহা বাত্রা টিম নিয়ে ওই স্কুলে চোখ পরীক্ষা করেন। এ বিষয়ে অধ্যাপিকা বিদ্যাবতী আগরওয়ালা, দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউটের তরফে কমলেশ গুহ এবং চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাঃ স্নেহা বাত্রা জানান তাদের রিপোর্ট। মোবাইল ব্যবহারের জেরে কিভাবে চোখের সমস্যা বাড়ছে সেদিকটিও মেলে ধরেন তাঁরা। দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট এবং অধ্যাপিকা বিদ্যাবতী আগরওয়ালার এই প্রয়াসের তারিফ করেন স্কুলের অনেক অভিভাবক।

মানুষ কিভাবে দেবত্বের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে, শ্রীঅরবিন্দের জন্মসার্ধশতবর্ষে বহু কর্মসূচি ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ মানুষ কিভাবে নিজের ভেতরের সৌন্দর্যের বিকাশ ঘটিয়ে দেবত্বের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে তার সঠিক দিশা দেখিয়ে গিয়েছেন শ্রীঅরবিন্দ। আজকের এই অশান্তময় পৃথিবীতে বড়ই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে শ্রীঅরবিন্দের দর্শন। নিজের অন্তরের আত্মশক্তির বিকাশ ঘটিয়ে মানুষ কিভাবে নিজেকে আরও উন্নততর করে তুলতে পারে তা জানা যায় শ্রীঅরবিন্দকে নিজের ভেতর থেকে গ্রহণ করলে। আর শ্রীঅরবিন্দের সেই আলোর পথ নিয়ে নিয়মিত আলোচনা হয়ে চলেছে শিলিগুড়ি মিলনপল্লীর লাইফ ডিভাইন ফাউন্ডেশনে। বিশিষ্ট অরবিন্দ অনুরাগী সঞ্জয় গোলেচা শ্রীঅরবিন্দের জন্মসার্ধশতবর্ষ উপলক্ষ্যে ওই সব কথা জানিয়েছেন খবরের ঘন্টাকে। ১৫ আগস্ট দেশের স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি এবং শ্রীঅরবিন্দের জন্মসার্ধশতবর্ষ। ১৫ আগস্ট শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিন। এ-উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ি মিলন পল্লী লাইফ ডিভাইন ফাউন্ডেশনে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সঞ্জয়বাবু জানিয়েছেন, শ্রীঅরবিন্দের জন্মসার্ধশতবর্ষ উপলক্ষ্যে তাঁরা ইংরেজি, হিন্দি ও বাংলা ভাষায় বই প্রকাশ করতে চলেছেন। শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কেবহু অজানা কথা, বহু তথ্য সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে চলেছে ওই বইগুলো। ১৫ আগস্ট বইগুলোর আবরণ উন্মোচন হবে। ১৫ আগস্ট তাঁরা শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে প্রশ্ন উত্তর আসরেরও আয়োজন করছেন। এভাবে সারা বছর ধরেই তাদের শ্রীঅরবিন্দ বিষয়ক অনুষ্ঠান হবে বলে সঞ্জয়বাবু জানিয়েছেন।

বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজ করেন সঞ্জয়বাবু। শিল্প প্রতিষ্ঠানেরও তিনি কর্ণধার। কিন্তু সব কাজের ফাঁকেই তিনি শ্রীঅরবিন্দ এবং শ্রীমা এর দর্শনকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করে চলেছেন।

শ্রীঅরবিন্দ স্মরনে রচনা ও অঙ্কন প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা,শিলিগুড়ি ঃ ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসে জন্মদিন শ্রীঅরবিন্দের। বিপ্লবী দেশপ্রেমিক ও অধ্যাত্মসাধক শ্রীঅরবিন্দের জন্মের সার্ধশতবর্ষ এ বছর। এই উপলক্ষ্যে দেশজুড়ে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। এর বাইরে নেই উত্তরবঙ্গও। শ্রীঅরবিন্দের জন্ম সার্ধশতবর্ষকে সামনে রেখে শিলিগুড়ি লাগোয়া রাজগঞ্জের বন্ধুনগরে অরোগাঁও ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশন ৪ঠা আগস্ট বন্ধুনগর দেবেন্দ্র নাথ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এক রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। তার সঙ্গে অঙ্কন প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়। রচনা প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে শ্রীঅরবিন্দের ভূমিকা। অঙ্কন প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল, শ্রীঅরবিন্দ, প্রকৃতি ও ভালোবাসা। ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশন থেকে তাপস কুমার দত্ত জানিয়েছেন, শ্রীঅরবিন্দের জন্ম সার্ধশতবর্ষকে সামনে রেখে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ৪ঠা আগস্টের রচনা ও অঙ্কন প্রতিযোগিতার পর ৭ই আগস্ট ওই এলাকারই পাথরঘাটা কলোনি এস পি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এরপর ১৩ আগস্ট হর ঘর মে তিরঙা কর্মসূচি পালিত হয়। ১৪ আগস্ট বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষা শিবির আয়োজন করা হয়। ৪ঠা আগস্ট রাজগঞ্জের বন্ধু নগর দেবেন্দ্র নাথ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাপস কুমার দত্ত ছাড়াও ওই বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটির সভাপতি আয়ুব হুসেন,সরকারি প্রধান শিক্ষক মিলন সিংরায়, শিক্ষক প্রনয় দেবনাথ,কল্যানি রায়,ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশনের তরফে চন্দ্রকান্ত মোহতা, দিলীপ আগরওয়ালা, দীপক কান্দোই, প্রাঞ্জল মোড়, সঞ্জীব আগরওয়ালা, দুধকুমার দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। স্কুলের শিক্ষিকা ফিরোজা সুলতানা শ্রীঅরবিন্দকে নিয়ে বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা একটি কবিতা পাঠ করে শোনান। দেশের জন্য বিভিন্ন স্বাধীনতা সংগ্রামী তাদের বিরাট অবদান ও আত্মত্যাগ রেখে গিয়েছেন। তারমধ্যে শ্রীঅরবিন্দ অন্যতম। স্বাধীনতা দিবসের এই শুভ সময়ে তাই শ্রীঅরবিন্দকে বেশি করে স্মরন করা জরুরি হয়ে পড়েছে বলে এদিন সেই অনুষ্ঠানে আয়োজকরা জানান। তাঁরা আরও বলেন, আজ মানুষ ঘরে ঘরে অশান্তিতে ভুগছে। এই সময় চাই শান্তি। আর সেজন্য শ্রীঅরবিন্দের যোগ সাধনাকে অন্তর থেকে উপলব্ধি করার সময় এসেছে।

ধ্বজা তুলবো ধরে সবাই মিলে

সজল কুমার গুহ
(শিবমন্দির, শিলিগুড়ি)

অসীম লড়াই লড়ে আনি দিল ওরা
ভারতের স্বাধীনতা,
মানেনি কোনোদিন ইংরেজদের বদান্যতা।
ভারত মায়ের মুক্তিই ছিল বীর সন্তানদের লক্ষ্য,
শত শত ত্যাগ তিতিক্ষা হয়ে আছে তার সাক্ষ্য।
কত না যাতনা সহে এনেছিল স্বাধীনতা ওরা,
ক্ষণিকের তরে স্মৃতি তাদের দেয় কি মোদের ধরা?
৭৫ বছরে গিয়েছি শহিদদের ত্যাগ ভুলি,
কৃতজ্ঞতার বদলে আওড়াই অহংকারের বুলি।
ভরে গেছে দেশ হানাহানি, সাম্প্রদায়িকতা ভ্রষ্টাচারে,
নেই ভাবনা তেমন দেশ গড়ার তরে।
এসো করি,সবে মিলে শপথ ৭৫ বছরে,
ভারত মায়ের ধ্বজা ধরবো তুলে সবার উপরে।

সকলকে স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা

সকলকে শিক্ষক দিবসের আগাম শুভেচ্ছা

পূবালি সেনগুপ্ত স্মৃতি সংস্থা

ভবিষ্যতে দুঃস্থদের জন্য বিনামূল্যে আইনি
পরিষেবা শুরুর চিন্তাভাবনায়
পূবালি সেনগুপ্ত স্মৃতি সংস্থা

পুজোর পর আবারও শুরু হতে চলেছে
পূবালি সেনগুপ্ত স্মৃতি সংস্থার বিভিন্ন কর্মকাণ্ড

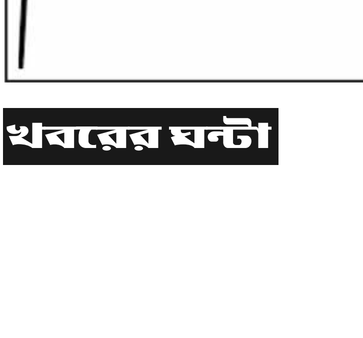

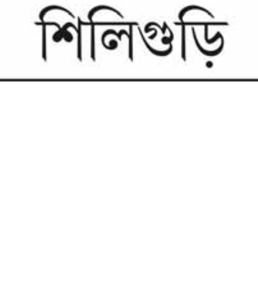

শিলিগুড়ি

অন্ধকারের মধ্যেও আলো রয়েছে

বিপ্লব সেনগুপ্ত
(অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও আইনজীবী, দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি)

সকলকে স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা। একইসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ জন্মসার্ধশতবর্ষ উপলক্ষ্যেও রইলো শুভেচ্ছা। এবছর আমাদের স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি। বহু দেশপ্রেমিক , স্বাধীনতা সংগ্রামীদের রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা দিবস এসেছে। মহাত্মা গান্ধী থেকে শুরু করে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস, শ্রীঅরবিন্দ, ক্ষুদিরাম বসু, বিনয়বাদলদীনেশ, বাঘাযতীন, মাস্টারদা সূর্য সেন থেকে শুরু করে বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী দেশের জন্য তাঁদের কষ্ট স্বীকার করেছেন। তাদের ঘাম, রক্তের বিনিময়ে এসেছে স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা তাই বেশ মূল্যবান। আজ সমস্ত দেশপ্রেমিক, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অন্তরের শ্রদ্ধা জানান।

আজ অনেকেই প্রশ্ন করেন, আমরা কি স্বাধীন? অনেক বড় প্রতিষ্ঠানে যুক্ত রয়েছেন এমন ব্যক্তিকেও বলতে শোনা যায়, দেশ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু আমরা কি স্বাধীন? যাঁরা এই ধরনের প্রশ্ন করেন, তাঁদের সঙ্গে আমি কিন্তু একমত নই। আমাদের দেশ যে স্বাধীন হয়েছে তাতে আমরাওতো কিছুটা স্বাধীন, এটা অস্বীকার করা যাবে কি? লোকসভা, রাজ্যসভা, বিধানসভা, স্থানীয় বিভিন্ন সভা গঠিত হয়েছে স্বাধীন ভারতে। আজ শুধু নেতিবাচক চিন্তা করলেই হবে না। ভারতের মতো এতবড় গণতান্ত্রিক দেশ পৃথিবীর কোথায় আছে? আমার যদি আজ কোনও অসুবিধা বা সঙ্কট হয় আমি কি ঠিক করে আমার কথাটা বলতে পারবো?আমার কি সেই স্বাধীনতা আছে? প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক। আমরা কি সেই স্বাধীনতা পেয়েছি? সব প্রশ্ন আমি যেভাবে করতে চাই তাতো করতে পারি না। সব প্রশ্নের সমাধানও আমি চাই না। কিন্তু একটা ন্যুনতম লড়াই করবার জায়গা আমাদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে কিন্তু আছে। শক্তিশালী বিচারব্যবস্থা রয়েছে। সুপ্রীম কোর্ট থেকে হাইকোর্ট, জেলাগুলোতে জেলা আদালত, মহকুমায় মহকুমা আদালত। এই বিচারব্যবস্থার মাধ্যমে কিন্তু আমরা বিচার পাই। আজ আমরা বহু নেতা, মন্ত্রীকে আমরা যেমন কাজের প্রশংসা করতে পারি তেমনই তাদের কাজ নিয়ে প্রশ্নও তুলতে পারি।

৭৫ বছরে আমাদের অনেক অগ্রগতিও হয়েছে। কিন্তু কিছু লোকের মধ্যে দেখি, কুৎসা বা কটূক্তি করার অহেতুক অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোনও কোনও মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে শোনা যায়, দেশ স্বাধীন হওয়াতে কি হয়েছে? এর থেকে ব্রিটিশ শাসনতো ভালো ছিল। স্বাধীনতার কি মূল্য? আমার মতে এধরনের মন্তব্য সমীচিন নয়। বহু রক্ত ঘাম এবং জীবনের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। সেই স্বাধীনতা একদম মূল্যহীন এমনটা ভাবার কোনও কারণ নেই।আমার মনে হয়, আমার কোনও সমস্যা হলে আমি কি লড়তে পারবো? কোনও কিছু সমস্যা হলে তার উত্তর বা সমাধান পাবো কি? এরজন্য আমাকে ভীতসন্ত্রস্ত থাকতে হয়। এরমধ্যেই বলবো আমাদের গণতন্ত্র সবথেকে বড় গণতন্ত্র।

শিক্ষাক্ষেত্রে একটা অন্ধকার চলছে। এরমধ্যেও বলবো, অনেক ছেলেমেয়ে ভালো কাজ করছে। হতাশা অতিক্রম করে তারা সুন্দর সুন্দর সব গবেষণা করছে। করোনার সময় অনেক ছেলেমেয়ে অসহায় বিপদগ্রস্থ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। তাঁরা অসুস্থ মানুষদের হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছে। গরিব মানুষদের খাবার পৌঁছে দিয়েছে।

এবারে বলছি আমাদের পূবালি সেনগুপ্ত স্মৃতি সংস্থার কথা। ২৮ বছর ধরে চলছে পূবালি সেনগুপ্ত স্মৃতি সংস্থা। বিগত দুবছর ধরে করোনার কারনে আমাদের অঙ্কন প্রতিযোগিতা থেকে সহ অন্যান্য সব অনুষ্ঠান বন্ধ ছিল। এখন করোনার প্রকোপ কমে যাওয়ায় আবার তা শুরু হতে চলেছে নতুন উদ্যমে।জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত হবে অঙ্কন প্রতিযোগিতা। তার সঙ্গে খাতা স্কুল ব্যাগ সহ অন্য শিক্ষা সামগ্রী প্রদানের অনুষ্ঠানও হবে । পুজোর পর দেশবিদেশের শিল্পীদের নিয়ে একটি ভাস্কর্য প্রদর্শনী আয়োজনের ইচ্ছে রয়েছে। তিন দিন ধরে সেই প্রদর্শনী চলবে শিলিগুড়িতে।

এখন আইন পেশাতে যুক্ত রয়েছি। ইচ্ছে রয়েছে ভবিষ্যতে দুঃস্থ অসহায়দের বিনামূল্যে আইনি পরিষেবা দেওয়ার জন্য কিছু একটা উদ্যোগ গ্রহনের।

সবশেষে বলবো, সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

(লেখক শিলিগুড়ি তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয় থেকে শিক্ষকতার চাকরিতে অবসরগ্রহন করেছেন চার বছর আগে। এখন আইন পেশায় যুক্ত। তাছাড়া তিনি একজন সমাজসেবীও)

শ্রীঅরবিন্দের জন্মের ১৫০ বৎসর পূর্তিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে

শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দ কথা

‘ অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার’

--বিশ্বকবি এভাবেই শ্রীঅরবিন্দের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন পরমযোগী,যোগেশ্বর, ঈশ্বরের পূর্ণ অবতার, বর্তমান ভারতবর্ষ- তাঁর মহত্ব খানিকটা উপলব্ধি করলেও প্রচারবিমুখ শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণ পরিচয় আজও জগৎবাসীর অজানা। তিনি ছিলেন অসামান্য মেধাবী,পন্ডিত চূড়ামনি, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কান্ডারী, জাতীয়তাবাদী এবং কর্মযোগী। কলকাতা মহানগরীর ৮, শেক্সপীয়ার সরনী, মাতামহ ঋষি রাজনারায়ন বসুর গৃহে ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট তিনি জন্মগ্রহন করেন। তাঁর পিতা ছিলেন ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ, মাতার নাম স্বর্ণলতাদেবী। চার ভাই ও একটি বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয়, ভাইদের নাম ছিল বিনয়ভূষন, মনোমোহন, অরবিন্দ ও বারীন্দ্র। বোনের নাম ছিল সরোজিনী। পিতার ইচ্ছা অনুযায়ী পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি দার্জিলিংয়ের লরেটো স্কুলে ভর্তি হন। এবং সাত বছর বয়সে পাড়ি দেন লন্ডন। ১৪ বছর সেখানেই তাঁর ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয়। সেন্ট পলস স্কুল থেকে অত্যন্ত মেধাবী এই ছাত্রটি প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ট্রাইপস অর্জন করেন, গ্রীক ও ল্যাটিনে সর্বোচ্চ নম্বর পান। ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান দখল করলেও শেষ পর্যন্ত ঘোড়া চড়ার পরীক্ষায় অনুপস্থিত থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে অকৃতকার্য হন। এই সময় তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের ‘আনন্দমঠ’ বইটি পড়েন, তাঁর মনে দেশপ্রেমের স্ফুরন ঘটে এবং তিনি ‘লোটাস এন্ড ড্যাগার ’ নামক গুপ্ত বৈপ্লবিক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হন। ১৮৯৩ সালে তিনি ভারতে ফিরে আসেন এবং বরোদার মহারাজা শায়জি গায়কোয়াড সসন্মানে তাঁকে প্রথমে বরোদা স্টেটের গুরুত্বপূর্ণ আধিকারিকের পদে এবং পরে বরোদা কলেজে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত করেন। জীবনের এই অংশে তিনি ভারতের ইতিহাস , ধর্ম, রাজনীতি,সাহিত্য ও সভ্যতার বিষয়ে বিশেষ আগ্রহী হয়ে পড়েন। এবং প্রচুর পড়াশোনা করে অগাধ পান্ডিত্য অর্জন করেন। নিজেই সংস্কৃত ভাষা শিখে তিনি রামায়ন, মহাভারত, বেদ, উপনিষদ , গীতা ইত্যাদি নানা ভারতীয় গ্রন্থ গভীর প্রজ্ঞার সাথে পাঠ করেন। এছাড়া গুজরাটি, বাংলা, মারাঠী প্রভৃতি নানা আঞ্চলিক ভাষাও তিনি আয়ত্ত করেন। ১৯০১ সালে ভূপালচন্দ্র বসুর কন্যা মৃণালিনীদেবীর সাথে তাঁর বিবাহ হয়। লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে এইসময় তিনি ভারতমাতার স্বাধীনতার স্বপ্নে গুপ্ত বৈপ্লবিক কাজকর্মের সাথে নিজেকে নিয়োগ করেন। এইসময়ই ভারতীয় যোগ সাধনার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ব্রহ্মানন্দ ও যোগী বিষ্ণুভাস্কর লেলে-র নিকট যোগ পদ্ধতি শেখেন। এইসময়ই সিস্টার নিবেদিতা ১৯০২ সালে বরোদায় এলে তাঁর সাথে পরিচিত হন এবং ভারতবর্ষের মুক্তির জন্য বিশদে আলোচনা এবং কর্মসূচি স্থির করেন। ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতে স্বদেশিকতার আগুন জ্বলে ওঠে, চারিদিকে যেন জনজাগরনের জোয়ার--প্রয়োজন ছিল একটি সুযোগ্য নেতৃত্বের। বরোদার লোভনীয় চাকরি ছেড়ে তিনি চলে এলেন কলকাতার জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদে। এরপরেই তিনি লালা লাজপত রায় ও বিপিন চন্দ্র পালের সাথে মিলিত হয়ে ভারতীয় কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশনে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তিনিই প্রথম উথথাপন করেন। এদিকে মানিকতলার মুরারীপুকুরে গোপন আস্তানায় চলতে থাকলো তরুনদের মধ্যে আন্দোলনের দীক্ষা-বিপ্লব। তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ভার নিলেন । তাঁর পরিচালনায় গুপ্ত সমিতিগুলোর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হলো। দেশবাসীর মনে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে বন্দেমাতরম পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করলেন ও সম্পাদকের দায়িত্ব নিলেন। ছুরির ফলার মতো ধারালো অকপট ভাষায় তিনি প্রতিবাদ জানালেন ব্রিটিশ সরকারের অনাচার অত্যাচারের বিরুদ্ধে । জ্বালাময়ী ভাষণ দিলেন নানা জায়গায়-- দেশবাসী দিকে দিকে উদ্বুদ্ধ হলো, সংগঠিত হতে থাকলো। ইংরেজ সরকার তাঁকে ভারতের ‘সবচেয়ে বিপজ্জনক ব্যক্তি’ হিসেবে চিহ্নিত করে ১৯০৭ সালের ২৭শে জুন কারা রুদ্ধ করলো। কিন্তু পত্রিকায় কোনো প্রবন্ধই তিনি নিজের নামে লিখতেন না, তাই তাঁর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগই গ্রাহ্য হলো না, তিনি মুক্তি পেলেন। ১৯০৮ সালে আলিপুর বোমা মামলায় আবার তাঁকে জেলবন্দি করা হয়। তাঁর বিচার চলে দীর্ঘ এক বছর। সে সময় তাঁর হয়ে আদালতে মামলা লড়েন ব্যারিস্টার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস। এবং তাঁর বাগ্মীতায় শ্রীঅরবিন্দ মুক্তি পান। আলিপুরের নির্জন কারাগারে বসে তিনি অধ্যাত্মজীবনের সন্ধান পান, দিব্য চেতনায় উদ্বুদ্ধ হন, জীবনের পূর্ণ রুপান্তর ঘটে। রাজনৈতিক নেতা , দেশপ্রেমিক অরবিন্দ হয়ে ওঠেন ভগবতপ্রেমী মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দ। ভগবান বাসুদেবের জন্ম হয়েছিল কংসের কারাগারে, সেই কারাগারের নির্জনতাই শ্রীঅরবিন্দ বাসুদেবের সাক্ষাৎ পান, তাঁকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন। সর্বত্র সর্বভূতে, এমনকি জেল কয়েদিদের মধ্যেও তিনি বাসুদেবকে দেখতে পেলেন। কোর্টে দাঁড়িয়ে ম্যাজিস্ট্রেট, সরকারি উকিল সকলের মধ্যে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করেন। তাঁর সমর্থনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আবির্ভাবের পিছনেও তিনি ঈশ্বরের নির্দেশ প্রত্যক্ষ করেন। কারা মুক্তির পর 2009 সালের তাঁর বিখ্যাত উত্তরপাড়া অভিবাসনে আলিপুর জেলে ভগবত দর্শনের অভিজ্ঞতা তিনি দেশবাসীকে জানান। এবং তাঁর সাধনার ধারার সুস্পষ্ট নির্দেশ ব্যক্ত করেন। অতঃপর ভগবদ চেতনায় উদ্বুদ্ধ শ্রীঅরবিন্দ ইংরেজিতে ‘কর্মযোগিন ’ ও বাংলায় ধর্ম নামক সাপ্তাহিক দুটি পত্রিকার মাধ্যমে জাতীয় সংগঠন কার্যে প্রেরনা দিতে থাকেন। কিন্তু সেই সময় একদিকে বিপ্লবের আগুন ও অন্যদিকে দমন নীতির বিভীষিকায় তাঁকে ব্রিটিশ সরকার পুনরায় গ্রেপ্তার করার পরিকল্পনা করলে তিনি কলকাতা তথা ব্রিটিশ ভারত ত্যাগ করেন। ১৯১০ সালের মার্চ মাসে তিনি ফরাসী উপনিবেশ চন্দননগরে চলে যান। এবং সেখান থেকে গোপনে ৪ঠা এপ্রিল ১৯১০ সালে সমুদ্র পথে পন্ডিচেরি গিয়ে পৌঁছন। যোগবলে তিনি জেনেছিলেন তাঁর অনুপস্থিতিতেও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে, একদিন ভারত স্বাধীন হবেই। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতাই একমাত্র তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো না--- তিনি চেয়েছিলেন জাতীয় জীবনে ভগবত শক্তির বিকাশ, মানব সমাজের আমূল পরিবর্তন এবং ভগবদ আদর্শের স্থাপনা। ব্যক্তিগত ভাগবত উপলব্ধি এবং যোগসিদ্ধি কখনও তাঁর একমাত্র ঈপ্সিত ছিল না। পন্ডিচেরির নির্জনতায় শুরু হলো তাঁর নীরব সাধনা, শান্ত সনাতন বিশ্ব পিতা সত্বার সঙ্গে নিবিড় পরিচয়। প্রথম অবস্থায় বহুদিন শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর সঙ্গীদের প্রচন্ড আর্থিক অনটনের মধ্যে কাটাতে হয়েছিল, কিন্তু এই অসীম ক্লেশেও তিনি ছিলেন অবিচলিত। তাঁর সঙ্গীরা সকলেই স্বেচ্ছায় তাঁর সাথে যোগ দেন, তিনি কখনও কাওকে আহ্বান জানাননি। তিনি ছিলেন তাঁদের সখা ,শিক্ষক ও গুরু। ১৯১৪ সালের ২৯শে মার্চ পন্ডিচেরিতে ঘটে এক মহাজাগতিক বিপ্লব-- মানব জীবনে আধ্যাত্মিকার অসীম সম্ভাবনার স্বর্ণ দুয়ার খুলে যায়,

দ্বিতীয় যুগাবতারের আবির্ভাব হয় বিশ্ব বিধাতার নির্দেশে। ফ্রান্স থেকে এসে পৌঁছান শ্রীমা--যাঁকে শ্রীঅরবিন্দ আদ্যা শক্তির জগৎ জননীর অবতার হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। ভারতবর্ষ এবং ইউরোপের মধ্যে এক গূঢ় বন্ধনের সূচনা হয়। এই বিশ্ব সংসার আদ্যাশক্তির সৃষ্টি , তিনি সমস্ত জ্ঞানশক্তির উৎস এবং এই মহাবিশ্ব তাঁরই আকর্ষনে তাঁর দিকেই ধাবিত হচ্ছে ---তিনি মূল চালিকাশক্তি।১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারি, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির তৎকালীন উৎস প্যারিস শহরে শ্রীমা-র জন্ম হয়। তাঁর নাম ছিল মীরা আলফাঁসা। পিতা ছিলেন তুর্কী এবং মাতা ছিলেন একজন মিশরীয়। স্বয়ং জগৎজননী মানবরুপ ধারণ করে শ্রীমায়ের রুপে এই ধরায় এসেছিলেন। স্বভাবতই খুব শিশু কাল থেকে তিনি তাঁর দিব্যজন্মের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পূর্ণ মাত্রায় সচেতন ছিলেন এবং অন্যান্য শিশুদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক স্বভাবের ছিলেন। পড়াশোনার সাথে সাথে তিনি ছবি আঁকায় ও বাদ্যযন্ত্রে বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। এবং টেনিস ইত্যাদি নানা খেলায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন। মানুষের চার পাশে সতত ক্রিয়ারত অসংখ্য অদৃশ্য শক্তিগুলোকে তিনি অল্প বয়স থেকেই প্রত্যক্ষ করতে পারতেন। নানারকম গুহ্য বিদ্যায় তিনি খুবই আগ্রহী ছিলেন, বিভিন্ন যোগীরা তাঁর মনোজগতে এবং স্বপ্নে প্রায়ই আসতেন এবং সাধনার নির্দেশ দিতেন। তাদের মধ্যে শ্যামল দেহ এক যোগীর সাথে তিনি খুবই স্বচ্ছন্দ ছিলেন এবং তিনি তাঁর নাম রেখেছিলেন কৃষ্ণ। একদিন যে তাঁর প্রত্যক্ষ দেখা তিনি পাবেন , সে ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। শ্রীমা তাঁর অন্তর জগতের নানা কাজে সবসময়ই ব্যস্ত থাকতেন, বর্হিজগতের কোলাহল তাঁকে স্পর্শ করতে পারতো না। তাঁরই নির্দেশে আধ্যাত্মিক সহচরদের নিয়ে ১৯০৫ সালে সেখানে গড়ে ওঠে 'আইডিয়া' নামক একটি ছোট দল --- যেখানে অধ্যাত্ম বিদ্যা এবং গুহ্য বিদ্যার নানা আলোচনা হোত। সেসময়ই Max Theon ও তাঁর স্ত্রীর সাথে তিনি কিছুদিন বুদ্ধ চর্চাও করেন আলজেরিয়া গিয়ে। মাত্র ৩৪ বছর বয়সে Cosmique নামক আর একটি দল তিনি প্রতিষ্ঠা করেন--- এক সম্পূর্ণ নতুন চেতনার অবতরন, একটি আদর্শ যৌথ সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং নবচেতনা সমৃদ্ধ এক নতুন মানব জাতির সৃষ্টির সম্ভাবনার পথ খুলে যায়। এইখানেই শ্রীঅরবিন্দের সাথে যৌথ ভাবে তাঁর ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের সূচনা নিশ্চিত হয়। তারপর থেকেই তিনি ভারতবর্ষের প্রতি একটা দুনির্বার আকর্ষন অনুভ্ব করতে থাকেন। ১৯১৪ সালের ২৯শে মার্চ তাঁর স্বামী পল রিশার (ফরাসি লেখক ও কূটনৈতিক) ও তিনি পন্ডিচেরি এসে পৌঁছন। ওইদিনই শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ মুহূর্তে তিনি তাঁকে চিরপরিচিত পরম সখা 'কৃষ্ণ' বলে চিনতে পারেন। পৃথিবীর বুকে অজ্ঞানতার ঘন অন্ধকারের শেষে আলোর অবতরন এবং দিব্য চেতনার জাগরনের নিশ্চিত সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করেন। সেই বছরই শ্রীমা ও পল রিশারের উদ্যোগে ১৫ই আগস্ট শ্রীঅরবিন্দের ৪২তম জন্মদিনে প্রকাশিত হয় 'আর্য' মাসিক পত্রিকা। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সূচনায় এক বছর পরই নানাকারণে শ্রীমা ও তাঁর স্বামী ফ্রান্সে ফিরে যান।১৯১৪ থেকে ১৯২১ সালের প্রথম দিক পর্যন্ত সম্পূর্ণ একার দায়িত্বে শ্রীঅরবিন্দ আর্য পত্রিকাটি পরিচালিত করেন। যোগ সাধনার সাথে সাথে এইসময় কালেই তিনি তাঁর সমগ্র যোগ সাহিত্য ও অন্যান্য পুস্তক (সাবিত্রী, যোগ সম্পর্কিত পত্রাবলী ও 'মা'গ্রন্থ ছাড়া) রচনা করেন। জেনে আশ্চর্য হতে হয় তাঁর অসাধারণ মেধা ও প্রজ্ঞার শক্তিতে তিনি দিব্যজীবন (লাইফ ডিভাইন) , যোগ সমন্বয়(সিন্থেসিস অফ যোগা), গীতা নিবন্ধ , ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি ও বেদ রহস্য ইত্যাদি বইগুলি তিনি একই সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে মাসিক আর্য পত্রিকায় প্রকাশ করতে থাকেন। এইগুলি পরবর্তীকালে ৩৬ খন্ডে তাঁর রচনাবলী হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯১৮ সালে তাঁর ধর্মপত্নী মৃণালিনীদেবীর দেহাবসান হয়। ১৯২০ সালের ২৪শে এপ্রিল জাপান হয়ে শ্রীমা স্থায়ীভাবে পন্ডিচেরি চলে আসেন---শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর সহচরদের জীবনে আমূল পরিবর্তন আসে। তাঁর আগমনে শ্রীঅরবিন্দের অর্ন্তসাধনা বহু গুনে ত্বরান্বিত হয়। শ্রীঅরবিন্দের অবতার-স্বরুপ শ্রীমা সবাইকে বুঝিয়ে দেন, শ্রীঅরবিন্দকে তিনি পরম প্রভু ও পরম যোগীর আসনে অভিষিক্ত করেন। গুরু ও শিষ্যের মধ্যে সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত, তাঁর সামনে একাসনে না বসে যে মাটিতে বসতে হয় ইতাদি শিষ্টাচার তিনি অন্যদের হাত ধরে শিখিয়ে দেন। শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর সহচর্যের খাওয়াদাওয়া থেকে শুরু করে বর্হিজীবনের সম্পূর্ণ তত্বাবধান তিনি করতেন। এবং আধ্যাত্মিক সাধনার নির্দেশ দিতেন। এইভাবেই ধীরে ধীরে তিনি ' মীরা 'থেকে শ্রীমা হয়ে ওঠেন। ১৯২৬ সালের ২৪শে নভেম্বর এলো সেই বহু প্রতীক্ষিত 'সিদ্ধি দিবস'। শ্রীঅরবিন্দের শরীরে কৃষ্ণ চেতনার অবচেতন ঘটে (অতিমানস চেতনা) এবং অতিমানস অবতরনের পথ নিশ্চিত হয়। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর দেহ , মন ও আত্মায় শ্রীকৃষ্ণের সাথে 'এক' হয়ে গেলেন। এদিনের পথ থেকে গভীরতর সাধনার জন্য শ্রীঅরবিন্দ মানব চক্ষুর অন্তরালে নিভৃতে চলে যান। এবং শ্রীমা প্রতিষ্ঠানের সমস্ত দায়িত্ব কাঁধে তুলে দেন। শ্রীঅরবিন্দের 'পূর্ণাঙ্গ যোগে' একটি নতুন যুগের সূচনা হল-- প্রতিষ্ঠা হল শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম। সাধারণের অন্তরালে চলতে থাকে শ্রীঅরবিন্দের নিরলস সাধনা, সারা দিন যোগ সাধনার পরেও প্রায় সারা রাত জেগে তিনি পত্রের মাধ্যমে সাধকদের নানা প্রশ্নের উত্তর দিতেন। পরবর্তী কয়েকবছরে আশ্রমের নানারকম কার্যক্রমের সূচনা হয় এবং সাধকদের সংখ্যাও ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। তখন বছরে চারবার শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দ একসাথে ভক্তদের দর্শন দিতেন--- এই গুলিকে দর্শন দিন বলা হয়। এইদিন গুলি ছিল ১৫ই আগস্ট (শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিন), ২১শে ফেব্রুয়ারি (শ্রীমার জন্মদিন), ২৪শে এপ্রিল (শ্রীমায়ের স্থায়ীভাবে পন্ডিচেরি আগমন) এবং ২৪শে নভেম্বর (সিদ্ধি দিবস)। এই দিনগুলিতে পরম শক্তিশালী এক উর্ধ্ব জাগতিক মহাচেতনার অবতরন হয়। এক নিমেষের দর্শনে বহু সাধকের জীবনে আমূল পরিবর্তন দেখা দিয়েছে, বহু সাধক তাঁদের সাধনার পথে বহু যোজন পথ অল্প সময়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন। অতি মানসের অবতরনকে ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর স্থুল শরীর ত্যাগ করেন। ১৯৫৬ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারি ঘটে 'অতিমানসের অবতরন'। শ্রীমা প্রত্যক্ষ করেন এক বিশাল স্বর্ণ নির্মিত সিংহ দুয়ার যা ঈশ্বর ও পৃথিবীকে আলাদা করে রেখেছে। তিনি তাঁর পরম চেতনার অতি শক্তিশালী হাতুড়ির এক অভিঘাতে সেই সিংহ দরজাকে চুরমার করেন। অতিমানস শক্তি এবং আলোকের অপ্রতিহত ঝর্ণা ধারায় অভিষিক্ত হয় এই পৃথিবী-- এক নতুন পৃথিবী নতুন চেতনায় জন্ম হয়। ১৯৫২ সালে শ্রীঅরবিন্দ আন্তর্জাতিক শিক্ষা কেন্দ্রের সূচনা হয় এবং ১৯৫৪ সালে পন্ডিচেরি রাজনৈতিকভাবে ফরাসি উপনিবেশ থেকে স্বাধীন ভারতবর্ষের অর্ন্তভুক্ত হয়। ১৯৬৪ সালে বিশ্ব মানবতার ঐক্যের স্বপ্নে শ্রীমা 'অরোভিল' নামক বিশনগরী প্রকল্পের সূচনা করেন। শ্রীঅরবিন্দ একেস্টত্র ঋুর্ণ্ঞ স্তু ঙ্গখন্দ্র (সূর্যোদয়ের নগরী) নামে অভিহিত করেছিলেন। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১২৬টি দেশের মাটি এনে ১৯৬৮ সালে এই নগরীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় এবং শ্রীমা স্বকন্ঠে এই নগরীর স্থাপনার সনদ পাঠ করেন। ১৯৯২ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি 'অরোভিলে' অবস্থিত 'মাতৃমন্দির'এর উদ্বোধন হয়। এখানে বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের এবং ভারতীয়রা প্রায় পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি মানুষ বাস করেন। ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর শ্রীমা তাঁর স্থূল শরীর ত্যাগ করেন। নিশ্চিতরুপে তিনি শ্বাশত চিরন্তনী। কাল ও সময়ের গতির উর্ধ্বে তাঁর অবস্থান। তিনি সেই এক ও অদ্বিতীয় দিব্য চেতনা -- এই পৃথিবীর শত কোটি জীবের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে চলেছেন। পন্ডিচেরি শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের প্রাঙ্গনে সমাধিস্থ আছে শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের দিব্যদেহ--- প্রতিদিন সেখানে শত সহস্র ভক্তের সমাগম হয়। এছাড়া ভারত ও সারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অসংখ্য সাধন কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত আছে তাদের দিব্যাংশ। অজ্ঞানতার অন্ধকারাচ্ছন্ন মানব জাতির ওপর শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমার করুনাধারা প্রতিনিয়ত বর্ষিত হয়ে চলেছে। ' ওঁ নমঃ ভগবতে শ্রীঅরবিন্দায় '

(সৌজন্যে ঃ ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশন, শিলিগুড়ি)